Visit Dwarkadheeshvastu.com For

FREE Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

****

All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

****

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

Geeta-Rasamrit-Bengali

সূচীপত্র

প্রথম প্রশ্ন	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ, তাঁদের বাক্য, উপবেশন এবং চলন সম্বন্ধে অর্জুনের জিজ্ঞাসা —'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা... কিমাসীত ব্রজেত কিম্' (গীতা ২।৫৪)	৫	
উত্তর প্রকরণ		৫-১৫
১. স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ		৫
২. স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা (ভাব)		৬
৩. স্থিতপ্রজ্ঞর অবস্থান		৭
৪. স্থিতপ্রজ্ঞর বিচরণ		১০
দ্বিতীয় প্রশ্ন		
কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ তাহলে ভগবান কেন তাকে কর্মে নিযুক্ত করছেন—এ বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা— 'জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে.....নিয়োজয়সি কেশব' (গীতা ৩।১)	১৬	
উত্তর প্রকরণ		১৭-৫২
১. কর্মযোগ ও জ্ঞাযোগের ভেদ		১৭
২. কর্মবিধি-নিষ্কাম কর্ম বা যজ্ঞ		২২
৩. ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা- লোকসংগ্রহ (ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা		৩১
(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা		৩৩
৪. জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ		৪১

তৃতীয় প্রশ্ন	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
অর্জুনের প্রশ্ন হল—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কেন পাপ করে ?—'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং ...বলাদিব নিয়োজিতঃ' (গীতা ৩।৩৬)	৫৩	
উত্তর প্রকরণ		৫৩-৭০
১. পাপে প্রবৃত্তির কারণ		৫৩
২. পাপ হতে নিবৃত্তির উপায়		৬৬
চতুর্থ প্রশ্ন		
ভগবানের জন্ম বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা —'অপরং ভবতো জন্ম.....ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি' (গীতা ৪।৪)	৭১	
উত্তর প্রকরণ		৭১-১০৭
১. ভগবানের জন্মের দিব্যতা		৭৬
২. ভগবানের কর্মের দিব্যতা		৮২
৩. জীবের কর্মে আসক্তি		৮৯
৪. কর্মের বিভাগ		৯০
৫. যজ্ঞের বিভাগ		৯৪
৬. তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়		১০১
৭. তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী		১০৬
৮. কর্মযোগী		১০৬
পঞ্চম প্রশ্ন		
কর্ম এবং সন্ন্যাস সম্বন্ধে বিভ্রান্ত অর্জুনের প্রশ্ন—'সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ.....তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্' (গীতা ৫।১)	১০৯	
উত্তর প্রকরণ		১১০-১৫৯
১. জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা		১১১
২. কর্মযোগ—শ্রেষ্ঠত্ব ও লক্ষণ		১১৩
সাধন ও মহিমা		১১৯

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৩. জ্ঞানযোগীর সাধন		১৩১
জ্ঞানযোগীর লক্ষণ		১৩৭
৪. ধ্যানের পদ্ধতি—		
বহিরঙ্গ সাধন		১৪৫
অন্তরঙ্গ সাধন		১৪৭
৫. ধ্যানযোগীর আচার		১৫১
৬. ধ্যানযোগীর সঙ্কল্প ত্যাগের উপায়		১৫২
৭. ধ্যানযোগীর সাধনার ফল		১৫৬
৮. ধ্যানরত—সাংখ্যযোগী		১৫৭
ভক্তিযোগী		১৫৭
৯. ভক্তিযোগী—		১৫৯

ষষ্ঠ প্রশ্ন

মনের চাঞ্চল্য হেতু তাকে বশ করতে অর্জুনের অক্ষমতা জ্ঞাপন—'যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্ত....বায়োরিব সুদুষ্করম্' (গীতা ৬।৩৩-৩৪) ১৬০

উত্তর প্রকরণ ১৬০-১৬৫

সপ্তম প্রশ্ন

সাধনে শিথিল প্রযত্নশীল ব্যক্তির অন্তকালীন গতি বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন—'অযতি শ্রদ্ধয়োপেতো.....হ্যপপদ্যতে' (গীতা ৬।৩৭-৩৯) ১৬৬

উত্তর প্রকরণ ১৬৬-২৭৫

১. যোগসাধনের উৎকর্ষতা	১৬৮
২. যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনাযুক্ত) গতি	১৬৯
৩. যোগভ্রষ্ট সাধকের (বাসনারহিত) গতি	১৭২

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৪. সাধকের (যোগীর) মাহাত্ম্য		১৭৩
ভক্ত প্রসঙ্গ		১৭৬
১. উপক্রম		১৮০
২. জ্ঞান-বিজ্ঞান		১৮৭
৩. নির্বুদ্ধি জীব		২০৩
৪. স্বল্পবুদ্ধি জীব		২১০
৫. জ্ঞানী জীব (প্রেমিক ভক্ত)		২২৩
৬. ভগবদ্ কৃপা		২৭৫
অষ্টম প্রশ্ন		
ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম আদি বিষয়ে অর্জুনের জিজ্ঞাসা—'কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং.... জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ'(গীতা ৮।১-২)	২৮০	
উত্তর প্রকরণ		২৮০-৩০৯
১. সাতটি প্রশ্নের উত্তর		২৮০
২. অভ্যাসযোগ ও ধ্যানযোগে ভগবৎ লাভ		২৯১
৩. ভক্তিযোগে ভগবৎ লাভ		২৯৭
৪. ব্রহ্মলোক ও পুনরাবর্তন		৩০১
৫. শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিপথ		৩০২
নবম প্রশ্ন		
সগুণ ও নির্গুণ উপাসকদের মধ্যে উত্তম যোগবেত্তা কে ? —'এবং সততযুক্তা যে..... যোগবিত্তমাঃ' (গীতা ১২।১)	৩১০	
উত্তর প্রকরণ		৩১০-৪৩৩
ভক্তিপ্রসঙ্গ—		৩১১
১. সগুণোপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ		৩১৫
২. নির্গুণোপাসক ভক্ত		৩১৮
৩. ভক্তর প্রতি ভগবানের কৃপা		৩২৩

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৪. ভক্তি সাধনার ক্রম		৩২৫
৫. ভক্তর লক্ষণ		৩৩৫
প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি		৩৫৬
১. ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ		৩৫৭
২. ক্ষেত্র		৩৬৫
৩. ক্ষেত্রজ্ঞ		৩৬৮
৪. জ্ঞান মার্গের সাধন		৩৭২
৫. পরমাত্মতত্ত্ব		৩৮৩
৬. পরমাত্মা-লাভের সাধন		৩৯৬
প্রকৃতির গুণ বন্ধন থেকে মুক্তি		৪০৭
১. জ্ঞানের মহিমা		৪০৮
২. জগৎ সৃষ্টি		৪০৯
৩. গুণ দ্বারা বন্ধন		৪১১
৪. গুণত্রয়র লক্ষ্মণ		৪১৫
৫. গুণের বৃদ্ধি ও অন্তকাল অনুসারে ফল		৪২২
৬. গুণাতীত অবস্থা		৪৩২
দশম প্রশ্ন		
গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, আচরণ আদি বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন—'কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্... চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে' (গীতা ১৪।২১)	৪৩৪	
উত্তর প্রকরণ		৪৩৫-৪৯৯
১. গুণাতীতের লক্ষণ		৪৩৫
২. গুণাতীতের আচরণ		৪৩৭
৩. গুণাতীত হওয়ার সাধনা		৪৩৮
পুনঃ ভক্তির বর্ণনা		৪৩৯
১. জগৎ সংসারের বৃক্ষরূপ বর্ণনা		৪৩৯
২. জীবাত্মার বর্ণনা		৪৪৮

	প্রশ্ন পৃষ্ঠা	উত্তর পৃষ্ঠা
৩. পরমাত্মার বিভূতি বর্ণনা		৪৫৭
৪. পরমাত্মার স্বরূপ		৪৬২
দৈবাসুরসম্পদ বর্ণনার উপক্রম—		৪৬৭
দৈবাসুরসম্পদ বিভাগ—		৪৬৮
১. দৈবী বা সাত্ত্বিক সম্পদ		৪৬৮
২. আসুরী সম্পদ		৪৮৩
৩. শাস্ত্রবিধি ত্যাগকারী ও অনুসরণকারীদের গতি		৪৯৮
একাদশ প্রশ্ন		
শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যজনকারীদের নিষ্ঠা সম্বন্ধে অর্জুনের জিজ্ঞাসা—'যে শাস্ত্র - বিধিমুৎসৃজ্য...সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ' (গীতা ১৭।১)		৫০০
উত্তর প্রকরণ		৫০০-৫১৯
১. শ্রদ্ধার প্রকারভেদ		৫০১
২. শ্রদ্ধাভেদে যজন ভেদ		৫০৩
৩. শাস্ত্রবিধি-রহিত কর্ম		৫০৪
শ্রদ্ধাভেদে ব্যবহারিক ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার বিভিন্নতা		৫০৫
শ্রদ্ধাভেদে আহারের প্রকার ভেদ		৫০৬
শ্রদ্ধাভেদে যজ্ঞের প্রকার ভেদ		৫০৯
নিষ্ঠাভেদে তপস্যার প্রকার ভেদ		৫১০
তপস্যার গুণভেদ		৫১২
নিষ্ঠাভেদে দানের প্রকার ভেদ		৫১৪
৪. ওঁ তৎ সৎ-এর তাৎপর্য		৫১৬
৫. শ্রদ্ধারহিত কর্মই অসৎ		৫১৯
সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি		৫১৯
দ্বাদশ প্রশ্ন		
সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানাবার জন্য অর্জুনের জিজ্ঞাসা— 'সন্ন্যাসস্য...কেশিনিষূদন' (গীতা ১৮।১)		৫২১

উত্তর প্রকরণ ৫২১-৬১৮

ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা ৫২৬

কর্মযোগ—

১. ভগবানের মত ৫২৭

২. গুণানুসারে ত্যাগের ভেদ ৫২৯

৩. ত্যাগীর ভাব ৫৩২

৪. কর্মফল ত্যাগ না করার ফল ৫৩৩

৫. কর্ম সম্বন্ধে উদাহরণসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ৫৩৭

প্রারব্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৫৪৮

সাংখ্যযোগ—

১. কর্মের হেতু ৫৫১

২. সাংখ্যযোগে মতির বিচার ৫৫২

৩. দুর্মতি—আত্মায় কর্তৃত্ব ভাব আরোপ করা ৫৫৩

৪. সুমতি—অহংকারহীন কর্তা ৫৫৪

৫. কর্মের প্রেরণা ও কর্মসংগ্রহ ৫৫৪

৬. গুণানুযায়ী বিভাগ ৫৫৫

(জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ)

৭. প্রকৃতিজাত সবই ত্রিগুণাত্মক ৫৭১

৮. বর্ণ-অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম ৫৭৩

৯. স্বধর্মানুযায়ী কর্ম ৫৭৯

১০. সাংখ্যযোগের সাধন ও অধিকারী ৫৮৫

ভক্তিযোগ—

১. পরাভক্তি কীভাবে লাভ হয় ও তার ফল ৫৮৮

২. শরণাগতির ফল ৫৯২

৩. অ-শরণাগতির ফল ৫৯৮

৪. গীতার গুহ্যতত্ত্ব ৬০২

৫. গীতা শ্রবণের অনধিকারীর বর্ণনা ৬১৮

৬. গীতার মাহাত্ম্য ৬২০
৭. অর্জুন ও সঞ্জয়ের ভগবৎ অনুভূতি ৬২৩
(ক) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬৩১
(খ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উল্লিখিত শ্লোকের পাদানুক্রমণিকা ৬৯২
(গ) ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকের অনুক্রমণিকা ৭১০
(ঘ) উপনিষদের উল্লিখিত শ্লোকের অনুক্রমণিকা ৭১৪
(ঙ) পাতঞ্জল যোগের উল্লিখিত শ্লোকের অনুক্রমণিকা ৭১৫
(চ) অন্যান্য শ্লোকের অনুক্রমণিকা ৭১৭

॥ শ্রীহরিঃ॥

চিত্রসূচী

১. কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
২. নবধা ভক্তি
৩. 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'— ভক্ত দ্রৌপদী, গজেন্দ্র, শবরী ও রন্তিদেব
৪. ভক্তির পঞ্চরস—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য
৫. শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া উপভোগ (ন্যায়প্রিয়তা)
৬. বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি .... পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীতা ৫।১৮)—সমদর্শিতা
৭. মহারাস
৮. শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কীর্তনের অলৌকিক প্রভাব

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গীতা রসামৃত

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥

সনাতন ধর্মের তিনটি শ্রেষ্ঠমার্গ (প্রস্থানত্রয়ী)—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এই তিন প্রস্থানত্রয়ীর অন্যতম, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ১৮টি অধ্যায়ের (১৮-২৫) অন্তর্গত।

গীতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

'উপনিষদ্ হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের সার আর গীতা হচ্ছে উপনিষদের সারাৎসার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালরূপে এই গাভীরূপী উপনিষদ্ হতে এবং পার্থরূপী বৎস সামনে রেখে দুগ্ধরূপী গীতার নির্যাস সুধীজনকে (ভক্তজনে) বিলিয়ে দিয়েছেন।'

গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের—১, সঞ্জয়ের—৪১, অর্জুনের—৮৪ এবং অবশিষ্ট ৫৭৪টি শ্লোক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কথিত।

গীতাও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচণ্ডীর মতো ষট সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচণ্ডীর মতো গীতা শুরুতেই ষট প্রশ্ন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিস্তৃত হয়নি। গীতায় অর্জুন কৃত দ্বাদশটি প্রশ্ন আছে সমগ্র গীতাব্যাপী এবং ভগবানও যেমন যেমন সংশয় এসেছে

তেমন তেমন তা নিরসন করেছেন।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সংকল্প জাগে যে 'আমি সৃষ্টি করব', 'আমিই বহুরূপ ধারণ করব'। **'একৈবাহং বহুস্যাম প্রজাজেয়'**।

কিন্তু সৃষ্টি কেন ? **'সৃষ্টা তু লীলা কৈবল্যম্'**।

এ হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার লীলাখেলা আর ভগবানের এই খেলায় জগৎ-সংসার, শরীরাদি হচ্ছে তাঁর খেলার সামগ্রী। জীবসকল কিন্তু এই প্রকৃত খেলা ভুলে, খেলার সামগ্রী অর্থাৎ শরীরাদিকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে ভ্রান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং ভগবৎ বিমুখ হয়ে পড়ে। জীব যাতে ঈশ্বরমুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য যোগ (সম্বন্ধ) খুঁজে পায় সেইজন্য যোগশাস্ত্ররূপী ভগবদ্গীতার আবির্ভাব। গীতায় তাই যোগের মাহাত্ম্য অনেক এবং একে যোগশাস্ত্র (ভগবানের সঙ্গে ভক্তর যুক্ত হওয়ার পথ) বলা হয়েছে।

তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার, ভক্ত ও ভগবানের, যোগী ও ঈশ্বরের পার্থক্য অনেক। ভগবানের যে জগৎসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির সামর্থ্য আছে, সে ক্ষমতা যোগীর থাকে না। ব্রহ্মসূত্র বলছেন ভক্ত **'জগৎ ব্যাপারবর্জম্'** (ব্রহ্মসূত্র. ৪।৪।১৯) অর্থাৎ যোগীর জগৎ সংসার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে না। তাঁর ক্ষমতা হয় কেবল সংসারের ওপর বিজয়প্রাপ্তির, সংসারের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব তাঁর প্রতি না পড়ার ওপর।

গীতায় অর্জুন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেননি, তিনি তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তাই শাস্ত্রাদিতে যতপ্রকার কল্যাণকর সাধন প্রণালী আছে যথা— কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, প্রাণায়াম, যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সকল সাধন প্রণালীই গীতায় সংক্ষেপে অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। গীতায় কোথাও কাউকে সম্প্রদায় বা সাধনপথ **পরিবর্তনের** কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে **পরিমার্জনের** কথা ; তাই সাধকজগতে গীতা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সমস্ত যোগ বা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সকল সাধনের মধ্যে

'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ' ও 'ভক্তিযোগ'ই বিশেষভাবে প্রচলিত। তাই ভগবান গীতায় এই তিনটি যোগই মুখ্যরূপে বলেছেন। ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ (ভাগবত ১১।২০।৬)

'নিজ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বলেছি —জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণ লাভের আর কোনো পথ নেই।'

এর মধ্যে যাঁর কর্মে অধিক রুচি ও আগ্রহ থাকে তিনি কর্মযোগের অধিকারী, যাঁর মধ্যে নিজেকে জানার আগ্রহ প্রবল তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী এবং যাঁর মধ্যে ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেশি তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী। এই সকল যোগপন্থাই পরমাত্মা প্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন এবং আর যা কিছু সাধন আছে সবই এই তিন সাধনার অন্তর্গত।

জ্ঞানযোগে বিবেকের (জানার) প্রাধান্য এবং ভক্তিযোগে শ্রদ্ধার (মানার) প্রাধান্য থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকে জানার ও মানার বিষয়ে জাগতিক কোনো উদাহরণই দেওয়া সম্ভব নয় ; কারণ জগৎকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন ও বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয় কিন্তু পরমাত্মাকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন-বুদ্ধির কোনো ভূমিকাই নেই কারণ পরমাত্মার অনুভব স্ব-স্বরূপে হয়, মন-বুদ্ধির দ্বারা নয়।

যেমন একটি স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ পরস্পরকে জানলে বা কথা বললে হয় না, যখন তারা পরস্পরকে গ্রহণ করে তখনই বিবাহ সংঘটিত হয়, সেইরকম যখন স্বয়ং নিজে জড় সংস্কার পরিত্যাগ করে পরমাত্মাকে গ্রহণ করে তখনই যোগ সংঘটিত হয়, তাঁরা যুক্ত হন। কর্মযোগে সকল প্রাণীতে আত্মভাবই জড়ভাবকে পরিত্যাগ করায়। জ্ঞানযোগে স্বয়ংই স্বয়ংকে (আত্মস্বরূপ) জেনে জড়ভাব পরিত্যাগ করে এবং ভক্তিযোগে স্বয়ংই ভগবানের শরণাগত হয়ে জড়ভাব পরিত্যাগ করে।

গীতার প্রথম অধ্যায়টির নাম 'অর্জুনবিষাদযোগ' অর্থাৎ অর্জুনের

মোহর বর্ণনা। আসক্তিতে মোহর শুরু এবং আত্ম-উপলব্ধিতে মোহর অন্ত (মোক্ষসন্ন্যাসযোগ—অষ্টাদশ অধ্যায়), এই হচ্ছে গীতার বর্ণনা।

বস্তুত গীতা উপদেশের প্রারম্ভের বীজ হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ (গীতা ১।৪৭)

'অতঃপর অর্জুন বিষাদযুক্তভাবে গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করে এবং যুদ্ধ না করার মনস্থ করে রথে উপবেশন করলেন।'

এই মোহজনিত অবস্থা থেকে অর্জুনের ক্রম উত্তরণ হয়েছে প্রতি অধ্যায়ে এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ে। অর্জুনের পরের পর প্রশ্নের ধারাতেই তা বোঝা যায়।

যদিও সমগ্র গীতায় বিভিন্ন স্থানে অর্জুন মোট ২৯টি প্রশ্ন করেছেন, তবে আলোচ্য বইটিতে আমরা সেগুলি সংযোজিত করে মুখ্যরূপে ১২টি প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় থেকে নবম (ও আংশিক দশম) অধ্যায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আটটি প্রশ্ন করেছেন তা মূলত কর্মজনিত সংশয় সম্বন্ধে।

দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ ও একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপদর্শনযোগ মূলত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ভরা অর্জুনের আকুতি ও স্তুতি।

অর্জুনের পরবর্তী ৪টি প্রশ্ন (দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায়) অনেক পরিণত এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরিপ্লুত।

শেষ অধ্যায়ে এসে অর্জুনের প্রশ্ন সমাপ্ত, সংশয় তিরোহিত। তিনি বলেছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (গীতা ১৮।৭৩)

'হে কৃষ্ণ ! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি স্মৃতিজ্ঞান ফিরে পেয়েছি। আমি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তোমারই ইচ্ছায় কর্ম (আত্মসমর্পণ) করতে প্রস্তুত।

প্রথম প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের মোহজনিত অভিব্যক্তি শুনে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ তথা কর্মযোগ (সমত্ব) সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করে বলেছেন—যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ পঙ্ক ও শাস্ত্রাদি মতভেদের বিক্ষিপ্ততা অতিক্রম করবে তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে এবং তোমার বুদ্ধিও পরমাত্মায় অচলা হবে—

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ (গীতা ২।৫৩)

তখন অর্জুনের সংশয় উপস্থিত হল যে, সাধক যোগপ্রাপ্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তাঁর লক্ষণ কী হবে ? তাঁর অন্যান্য গুণই বা কী ? তাঁর প্রশ্ন হল—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ (গীতা ২।৫৪)

'অর্জুনের জিজ্ঞাসা—স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ কী ? তাঁরা কীভাবেই বা কথা বলেন ? কীভাবে থাকেন ? কীভাবেই বা চলেন ?'

এর উত্তর ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাকি ১৮টি শ্লোকে (শ্লোক ৫৫-৭২) দিয়েছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ	শ্লোক ৫৫
স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা (ভাব)	শ্লোক ৫৬-৫৭
স্থিতপ্রজ্ঞর অবস্থান	শ্লোক ৫৮-৬৩
স্থিতপ্রজ্ঞর বিচরণ	শ্লোক ৬৪-৭২

স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ—(শ্লোক ৫৫)

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

(গীতা ২।৫৫)

'ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যখন সাধক তাঁর সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।'

জগতে দুই প্রকার ব্যক্তি আছে—স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ও অস্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। অস্থির বুদ্ধিদের বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত আর স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই প্রকরণের পঞ্চান্ন থেকে বাহাত্তর শ্লোক পর্যন্ত। সমত্ব প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধির স্থিরতা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে মনের স্থিরতার (চিত্তবৃত্তি নিরোধের) কথা বলা হয়েছে কিন্তু গীতায় **বুদ্ধির স্থিরতাকে (উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা)** বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মন স্থির হলে লৌকিক সিদ্ধি এবং বুদ্ধি স্থির হলে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ হয়। ভগবান তাই বলেছেন **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮)। যোগস্থ বা সমত্ব হল যা কিছু কর্ম করা হয় তা পূর্ণ হোক বা না হোক তাতে সমভাব বা সমবুদ্ধি রাখা।

স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা (ভাব)—(শ্লোক ৫৬-৫৭)

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা ২।৫৬-৫৭)

'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে বিগতস্পৃহ, ভয় ও ক্রোধ রহিত হন।

তিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং শুভ-অশুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও অসন্তুষ্ট হন না।' (গীতা ২।৫৬-৫৭)

অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞর ভাষা অর্থাৎ তাঁরা কীভাবে কথা বলেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞর কী ভাব—তা বর্ণনা করেছেন। কর্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হন কারণ তাঁর মুখ্য লক্ষ্য হল অপরের হিতার্থে কর্ম করা, যার ফলে তাঁর কর্মফলে আসক্তি ও কর্মে মমতা জন্মায় না। কর্মে সর্বদা

অনাসক্ত থাকাই হল কর্মযোগীর সাধনা। তাই যোগী সুখ-দুঃখ, রাগ-ভয়-ক্রোধ আদি দ্বন্দ্বরহিত হন।

স্থিতপ্রজ্ঞর অবস্থান—(শ্লোক ৫৮-৬৩)

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দ্রষ্ট্বা নিবর্ততে॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২।৫৮-৬৩)

'যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদিক থেকে সঙ্কুচিত করে রাখে, তেমনি কর্মযোগীও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংহরণ করে নেন (অপসরণ করে নেন), ফলে তাঁর বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।

অনাহারী (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও (বিষয়)তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাঁর সংসারে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না।

হে কুন্তীনন্দন ! (বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকলে) যত্নশীল বিবেকবান মানুষের প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়গুলি তার চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে।

অতএব কর্মযোগী সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে যেন আমাতে চিত্ত

সমাহিত করে অবস্থান করেন ; কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাঁরই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত (স্থিতপ্রজ্ঞ) বলা হয়।

বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে উৎপন্ন হয় কামনা অর্থাৎ বিষয়ভোগের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তাতে বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্মায় ক্রোধ।

ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ বা মূঢ়তা। মূঢ়তা থেকে হয় স্মৃতিভ্রংশ বা বুদ্ধিভ্রষ্ট। স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হয়ে গেলে হয় মানুষের পতন বা বিনাশ।' (গীতা ২।৫৮-৬৩)

আটান্ন শ্লোকে ভগবান এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর লক্ষণকে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ কচ্ছপ যেমন বাইরের কোনো স্পর্শ পেলেই তার ছয়টি অঙ্গ (চার পা, লেজ ও মাথা) গুটিয়ে নেয় সেইরকম স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও বিষয় সংস্পর্শ দেখলে তার ছয় অঙ্গ (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন) প্রত্যাহার করে নেন। ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় থেকে সর্বতোভাবে প্রত্যাহৃত হলে পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুভূত হয়, যা কোনো ক্রিয়া বা ত্যাগের ফল নয় কারণ এই তত্ত্ব নতুন উৎপন্ন হওয়ার মতন বস্তু নয়, ইহা স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য প্রকাশমান থাকলেও চোখ বন্ধ করলে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন হলেই সূর্য দেখা যায় এবং এটির মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, সেই রকম ভোগ ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধরূপ আচ্ছাদন অপসারিত হলেই পরমাত্মতত্ত্বও স্বতঃই অনুভূত হয়।

উনষাট থেকে একষষ্টি শ্লোকে ভগবান সংসারে আসক্তির কারণ ও তার থেকে নিবৃত্তির কথা বলেছেন। ভোগের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নিলে অন্তরে ভোগের জন্য যে সূক্ষ্ম আকর্ষণ, প্রিয়তা, ভালোবাসা তৈরি হয় তাকে বলে 'রস'। যতক্ষণ পর্যন্ত সংযোগজনিত সুখে ব্যক্তির 'রসবুদ্ধি' থাকে ততক্ষণ তার প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যাদির (ক্রিয়া, পদার্থ ও ব্যক্তির) প্রতি পরাধীনতা বজায় থাকে। এমন অবস্থায় পরমাত্মার অলৌকিক রস প্রকটিত তো হয়ই না বরঞ্চ তাদের পরমাত্মা প্রাপ্তির দৃঢ়তাও থাকে না—**'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্'** (গীতা ২।৪৪)। তত্ত্ববোধ হলে এই রসবুদ্ধি শুকিয়ে যায় এবং আসক্তিরও নিবৃত্তি হয় তখন 'পরং

দ্রষ্ট্বা নিবর্ততে' (গীতা ২।৫৯)। তত্ত্ববোধ হওয়ার পূর্বেও বৈরাগ্য, সৎসঙ্গ, সাধুর কৃপা বা সঙ্গদ্বারাও রস নিবৃত্ত হতে পারে ; আবার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—এই তিন সাধনার সাহায্যেও বিনাশশীল ভোগের রস নিবৃত্ত হয়। কর্মযোগে সেবার রস, জ্ঞানযোগে তত্ত্ব অনুভবের রস এবং ভক্তিযোগে প্রেমের রস যেমন যেমন অনুভব হতে থাকে তেমন তেমন বিনাশশীল রস দূর হতে থাকে। রসবুদ্ধি থাকলে ভোগপ্রাপ্তি হলেই মানুষের চিত্ত চঞ্চল হয় এবং সে ভোগের বশীভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃত্ত মহাপুরুষদের চিত্তে ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হলেও বিন্দুমাত্রও বিকার উৎপন্ন হয় না। তখন সে **'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামাকামি'** (গীতা ২।৭০)। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার পূর্বে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়গুলির সম্মুখীন হলে ভোগ্যপদার্থের প্রতি (নিজ সংস্কার বশে) আসক্ত হয় এবং অনেক সময় বিবেকবান ব্যক্তিদেরও ইন্দ্রিয় আপন বশে থাকে না। অনেক ঋষি-মুনিদের ক্ষেত্রেও এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়। তাই ভগবান বলছেন—**'যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ'** (গীতা ২।৬০)—তাই কখনো এরকম অহংকার করা উচিত নয় যে আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছি।

নিজ সামর্থ্যর প্রতি অহংভাব সাধকের উন্নতির পথে বড় বাধক। তাই ভগবান বলছেন—**'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমের কারণ হিসেবে নিজেকে না দেখে, ভগবৎ কৃপাকেই কারণ বলে মনে করো। মানব দেহলাভ, সাধনায় রুচি হওয়া, তাতে ব্যাপৃত থাকা এবং সিদ্ধিলাভ করা এসবই ভগবৎকৃপা—এই ভেবে ভগবৎপরায়ণ হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

দুর্লভং ত্রয়ং এতৎ দৈবানুগ্রহ কারকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষ্যত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ম্॥

ভগবান এই প্রকরণের শেষের দুই শ্লোকে অর্থাৎ বাষট্টি ও তেষট্টি শ্লোকে কাম, ক্রোধ ও লোভের কথা বলেছেন। কামনা হল রজোগুণ বৃত্তি, মোহ হল তমোগুণবৃত্তি ও ক্রোধ হল রজ ও তম গুণের মিশ্রণ। ক্রোধ তখনই হয় যখন কোথাও আসক্তি থাকে। যদি কখনো ন্যায়নীতির বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতি ক্রোধ হয় তবে বুঝতে হবে ন্যায়নীতির প্রতি

অনুরাগ আছে। যদি অপমান ও তিরস্কারীর ওপর ক্রোধ জন্মায় তাহলে বুঝতে হবে মান ও সম্মানের প্রতি অনুরাগ আছে। নিন্দাকারীর ওপর ক্রোধ হলে বুঝতে হবে প্রশংসার প্রতি আসক্তি আছে।

আর ভগবান বলেছেন **'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ'** অর্থাৎ ক্রোধ হতে সম্মোহ আসে অর্থাৎ মূঢ়তা চিত্তকে আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মমতা—এই চারটি থেকেই সম্মোহ আসে।

কামনার সম্মোহ—এতে বিচার-বিবেচনা লোপ পায় এবং লোভের বশে মানুষ উপযুক্ত নয় এমন কাজও করে ফেলে।

ক্রোধের সম্মোহ—ক্রোধের সম্মোহে মানুষ তার প্রিয়জন ও পূজ্য-ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ কথা বলে ফেলে আর অনুচিত কাজ করে বসে।

লোভের সম্মোহ—মানুষের সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম বিচার থাকে না এবং সে কপট ব্যবহার করে লোক ঠকায়।

মমতার সম্মোহ—এতে মানুষের ব্যবহারে সমতা (সমত্ব) নষ্ট হয় এবং সে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে পড়ে।

এখানে বিষয়চিন্তা থেকে আসক্তি, তার থেকে কামনা, তার থেকে ক্রোধ, ক্রমে সম্মোহ, তৎপরে স্মৃতিভ্রংশ, তারপরে বুদ্ধিনাশ এবং শেষে পতন—এই যে বৃত্তির ক্রম বলা হয়েছে তা হতে কিন্তু দেরি হয় না। অন্তরের সংস্কার বিদ্যুৎ প্রবাহের মতন এইসব বৃত্তি তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন করে মানুষের পতন ঘটায়।

স্থিতপ্রজ্ঞর বিচরণ—(শ্লোক ৬৪-৭২)

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥

(গীতা ২।৬৪-৭২)

'কর্মযোগী সাধক চিত্ত নিজ বশীভূত এবং মন অনুরাগ ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগও করেন তবু তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন।

সাধকের হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মালে শীঘ্রই তাঁর সমস্ত দুঃখ দূর হয়। এইরূপ প্রসন্ন হৃদয় সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে পরমাত্মায় স্থিতিলাভ করে।

আর যারা সংযতচিত্ত নয় এইরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি আসে না এবং বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা না হওয়াতে তাদের মধ্যে নিষ্কামভাব বা কর্তব্য-নিষ্ঠাও আসে না। নিষ্কামভাব না থাকলে শান্তি আসবে কীভাবে, আর শান্তি না আসলে সুখ কোথায়। (গীতা ২।৬৪-৬৬)

যেমন জলে ভাসমান নৌকাকে পবন (বায়ু) ইচ্ছেমতন নিয়ে যায়, সেইরকম নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণশীল একটি ইন্দ্রিয়ও যখন মনকে বশীভূত করে নেয়, তখন সেই ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাকে (কর্তব্যপরায়ণতা, বিবেক) হরণ করে থাকে।

হে অর্জুন! তাই যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ্যবিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয়েছে তাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে।

সমস্ত মানুষের পক্ষে যা অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্থাৎ পরমাত্মা-বিমুখতা তাতে

সংযমী ব্যক্তি জাগরিত থাকেন এবং যাতে সাধারণ মানুষ জাগরিত থাকে (অর্থাৎ জাগতিক ভোগ সঞ্চয় করে) তা আত্মদর্শী মুনিগণ রাত্রিস্বরূপ (বিঘ্নস্বরূপ, অসার) মনে করেন।

আবার যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে নদনদীর জল মিশলেও তা অচলরূপে বিরাজ করে, তেমনি সংযমী মানুষের মধ্যেও যখন বিষয়সকল প্রবেশ করে তা বিলীন হয়ে যায়, তাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না, তিনি পরমশান্তি লাভ করেন। যিনি ভোগবাসনা রাখেন তিনি শান্তি লাভ করেন না।

আর যিনি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, মমতাশূন্য এবং অহংকাররহিত হয়ে বিচরণ করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

একেই বলে ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিতি)। জীবের এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর মোহগ্রস্ত হন না। মৃত্যুকালেও যদি কেউ এই অবস্থা লাভ করে তবে তিনি নির্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।' (গীতা ২।৬৭-৭২)

ভগবান এই প্রকরণে সংযমী সাধক ও অসংযমী ব্যক্তির কথা বলেছেন। আসক্তিসহ বিষয় ভোগ করলে পতন আর আসক্তি ত্যাগ করে বিষয়ভোগ করলে উন্নতি হয়। যিনি অসংযমী তার কখনো 'আমাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি' করতেই হবে এইরূপ একনিষ্ঠতা থাকে না। সে কখনো সম্মান, কখনো সুখ ও আরাম, কখনো অর্থ আবার কখনো ভোগসুখাদি আকাঙ্ক্ষা করতেই থাকে আর তার মধ্যে এইরূপ নানা কামনা উৎপন্ন হতে থাকার ফলে তার বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয় না। বুদ্ধি একনিষ্ঠ না হলে সে কর্তব্য-কর্ম থেকে বিচ্যুত হয় এবং তাই তার অশান্তির কারণ হয়। যার মন অশান্ত সে কখনো সুখী হতে পারে না। ভগবান বলছেন **'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'**।

মনে যখন কোনো বিষয়ের গুরুত্ব স্থান পায় তখন সেই বিষয় ভোগকারী ইন্দ্রিয় মনকে তার অনুগামী করে নেয় এবং মনে ভোগবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই ভোগবুদ্ধিই সাধকের বুদ্ধি নাশ করে তার প্রজ্ঞা হরণ করে। ইন্দ্রিয়র সঙ্গে মনের যোগ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ওই ইন্দ্রিয়র নিজ বিষয়েও কোনো জ্ঞান থাকে না— **'অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে'** (গীতা ১৫।৯)। এখানে

উদাহরণ দিয়ে বায়ুতাড়িত নৌকার কথা **'বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি'** বলা হয়েছে। বায়ু নৌকাকে দুভাবে বিঘ্নিত করতে পারে—পথভ্রষ্ট করতে পারে বা ডুবিয়ে দিতে পারে। আবার বায়ুর ক্রিয়াকে নিজ অনুকূলে আনতে পারলে নৌকা নিজপথ থেকে তো বিচ্যুত হয়ই না উপরন্তু তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সেইরকম ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হওয়া মন, বুদ্ধিকে দুইভাবে বিচলিত করে। এক, পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছেকে দমিয়ে ভোগপ্রাপ্তির ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায় অথবা অবৈধভোগে নিযুক্ত করে পতন ঘটায়। যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত, সেই সাধকের মন বুদ্ধিকে বিচলিত করতে পারে না, বরং পরমাত্মার নিকট পৌঁছাতে সাহায্য করে। তাই **'প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'** তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয় যার ইন্দ্রিয় **'নিগৃহীতানি সর্বশঃ'** (গীতা ২।৬৮) অর্থাৎ যে সাধকের মন সাংসারিক ব্যবহারের সময় বা একান্তে চিন্তার সময়ে কোনো অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়াদির ভোগ বা বিষয় চিন্তায় লিপ্ত হয় না। মন কোনো অবস্থাতেই বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে সক্ষম না হওয়ার কারণ তাঁর মূল লক্ষ্য হল পরমাত্মাকে লাভ করা, ভোগ-বিলাস বা সম্পদ সংগ্রহ নয়।

ভগবান সংযমী ও অসংযমী (ভূতানি) সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—কিছু সাংসারিক ব্যক্তি রাত-দিন ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, তারা সাংসারিক কাজে অত্যন্ত সাবধান ও নিপুণ, নানা বস্তু আবিষ্কার করে, লৌকিক বস্তুর প্রাপ্তি হলে নিজের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করে, সাংসারিক বস্তুসমূহের প্রশংসা করে ইত্যাদি।

আবার কিছু সকামী ভক্ত সুখভোগ-এর উদ্দেশ্যে বড় বড় যাগযজ্ঞ করে, দেবতাদের পূজা অর্চনা করে, জপতপ করে কিন্তু এসবই হয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে **'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ'** (গীতা ১৬।১১), কখনোই নিজের কল্যাণের নিমিত্ত নয়। পারমার্থিক বিষয়ের দিকে তাঁদের বুদ্ধি যায় না কারণ তাদের দৃষ্টি সদাই **'যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি'** (গীতা ২।৬৯) অর্থাৎ চিত্ত সদা বাসনা পরিপ্লুত।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এবং সত্যকার সাধকের কাছে বিষয়-চিন্তা হল রাত্রি, অন্ধকারের মতো, যা সদা দৃষ্টির অন্তরালেই থাকে—**'সা নিশা**

পশ্যতো মুনেঃ'। তাঁদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জগৎ বলে কিছু নেই। সংসারী ব্যক্তি কেবল রাত্রিই দেখেন, দিনকে দেখেন না যোগী কিন্তু দিন ও রাত উভয়ই দেখেন কিন্তু গ্রহণ করেন বাসনা ত্যাগ, গ্রহণ করেন অনাসক্তি—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

যেমন বালক শুধু বাল্য অবস্থাই দেখেছে, যৌবন দেখেনি, বৃদ্ধাবস্থাও দেখেনি কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা সবই দেখেছেন। যিনি অর্থসংগ্রহ করে জমিয়ে রাখেন তিনি অর্থত্যাগের মাহাত্ম্য জানেন না। তিনি একদর্শী। কিন্তু যিনি প্রাপ্ত অর্থ দান করেছেন, তিনি অর্থ জমাতেও জানেন আর ত্যাগ করতেও জানেন। তিনি বহুদর্শী। বক্তব্য হল সংসারে ব্যাপৃত ব্যক্তি সংসারের রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ। আর যিনি সংসার থেকে পৃথক হওয়ার সাধনা করেন তিনি সংসার ও পরমাত্মা উভয়কেই জানতে পারেন, তিনি বহুজ্ঞ, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা নয়। ভগবান তাই বলেছেন **'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী'**।

সাধক যখন কামনারহিত হন, তখন তাঁর কাছে জগৎও চিন্ময় হয়ে ওঠে। তিনি সর্বত্রই দেখেন **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। তাই ভগবান বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সংসারের কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও অহংবোধ পরিত্যাগ করায় শান্তিলাভ করেন।

অহংবোধ ও মমত্ববোধ ত্যাগের উপায়—

কর্মযোগের দৃষ্টিতে—কোনো কিছুই আমার নয়, আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর শরীরাদির সঙ্গে সংসারেরই অভিন্ন সম্পর্ক (আছে)। তাই শরীর (আমি) এবং নিজের (আমার) বলে মনে করা সকল বস্তু দ্বারা যা কিছু করা হয় তা তিনি শুধু জগতের হিতের জন্যই করে থাকেন।

সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে—আমি আছি নয়, শরীরটা আছে—এই উপলব্ধি করা। মনের ভাব আমির বদলে শরীরটা আছেতে স্থিত হলে অহংবোধ ও মমত্ববোধ দূর হয়।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে—যাকে আমি বা আমার বলা হয় তা সবই প্রভুর।

তাঁর বস্তু প্রভু যেভাবে রাখেন তিনি সেইভাবে থাকেন। তার অনুভব হয় আমার বলে যে শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি—এ সমস্তই তাঁর এবং আমিও তাঁর।

এই তিন যোগসাধনের মূল উদ্দেশ্যই হল মোহ দূর করা।

সৎ এবং অসৎ ঠিকভাবে না জানাই হচ্ছে মোহ। অর্থাৎ আমি স্বয়ং সৎ হয়েও অসৎ-এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করাই হল মোহ। অসৎ জানলেই অসৎ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মোহ দূর হয়। অসৎকে জানলেও যদি মোহ নিবৃত্তি না হয় তবে বুঝতে হবে যে অসৎকে ঠিকভাবে জানা যায়নি, শোনা হয়েছে, শেখা হয়েছে মাত্র। শেখা জ্ঞান দ্বারা অসৎ নিবৃত্ত হয় না।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন—ব্রহ্মস্থিতি হচ্ছে তত্ত্ব উপলব্ধি এবং এই স্থিতিতে সাধক আর কখনো মোহগ্রস্ত হন না **'নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি'**।

ভগবান আরও বলছেন মৃত্যুকালেও যদি সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হন তবে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন—**'স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি'**।

ভগবান এই কথা গীতায় অন্য স্থানেও বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ (গীতা ৮।৫)

এখন একটি সংশয় আসতে পারে যে, সমস্ত জীবনে যে অনুভূতি হয়নি তা মৃত্যুকালে, যখন শরীর মন বিকল হয় সেই অবস্থায় তা লাভ করা কীভাবে সম্ভব ? এর উত্তর এই যে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বুদ্ধি, বিবেক অপেক্ষা দৃঢ়তা, লক্ষ্য ও শ্রদ্ধারই প্রয়োজন রয়েছে। সেই লক্ষ্য পূর্ব অভ্যাস, কোনো শুভ সংস্কারবশতই হোক অথবা ভগবানের বা কোনো সন্ত মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপাবশতই হোক, সংঘটিত হতে পারে।

———○———

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অর্জুনের মোহজনিত বিষাদ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান তা দূর করার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ (বা জ্ঞানযোগ) বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে 'স্থিতপ্রজ্ঞের' অতি মহৎ অবস্থা শুনে অর্জুন জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অধ্যায়ব্যাপী তাঁর উপদেশে বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা করতে বলেছেন আবার সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধও করতে বলেছেন। ভগবান যুদ্ধের সম্বন্ধে বলেছেন— **'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ'** (গীতা ২।৩), **'তস্মাদুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ'** (গীতা ২।৩৭)। আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্বন্ধে বলেছেন—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮)—কর্ম করতেই তোমার অধিকার, সমত্বে স্থিত হয়ে তুমি কর্ম করো। **'দূরেণ হ্যবরং কর্ম'** (গীতা ২।৪৯)—সকাম কর্ম বুদ্ধিযোগের থেকে তুচ্ছ। **'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'** (গীতা ২।৪৯)—বুদ্ধিযোগের শরণ গ্রহণ করো। **'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে'** (গীতা ২।৫০)—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষের পাপ ও পুণ্য এ জন্মেই ত্যাগ হয়। **'তস্মাদ্ যোগায় যুজস্য যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** (গীতা ২।৫০)—তুমি সমত্ব লাভের চেষ্টা করো, কেননা সমতাই কর্মের কৌশল।

ভগবান 'বুদ্ধিযোগ' (গীতা ২।৫০) দ্বারা সমত্বে স্থিত থেকে কর্মযোগের পালন করতে অর্থাৎ যুদ্ধে নিযুক্ত হতে বলেছেন কিন্তু অর্জুন এটির (সমত্ব বুদ্ধির) অর্থ জ্ঞান মনে করে ভ্রমবশত সংশয়ী হয়ে পড়েছেন। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জুন দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ (গীতা ৩।১-২)

'হে জনার্দন! আপনি যদি বুদ্ধিকে (জ্ঞানকে) কর্ম হতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তাহলে কেন আমাকে এই ঘোর কর্মে নিযুক্ত করছেন ?

আপনার এই দুরকম কথায় আমার বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। অতএব আপনি এমন কথা নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমার সত্যকার কল্যাণ হয়।' (গীতা ৩।১-২)

ভগবান এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তৃতীয় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোক থেকে ৩৫তম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভেদ	শ্লোক ৩—৮
কর্মবিধি—নিষ্কাম কর্ম (যজ্ঞ)	শ্লোক ৯—১৬
ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—লোকসংগ্রহ	শ্লোক ১৭—২৬
(ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা	শ্লোক ২২-২৪
(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা	শ্লোক ১৭-২১, ২৫-২৬
জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ	শ্লোক ২৭-৩৫

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভেদ—(শ্লোক ৩—৮)

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥
ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥

(গীতা ৩।৩—৮)

ভগবান বলছেন—'হে অর্জুন ! এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে তা আমি আগেই বলেছি। জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে আর যোগীদের নিষ্ঠা হল কর্মযোগে।

মানুষ কর্ম না করলেই যে নৈষ্কর্ম প্রাপ্ত হয় তাও নয় আবার কর্মত্যাগ করলেই যে সিদ্ধিলাভ হবে তাও নয়।

কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থাতেই ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রত্যেক প্রাণী তার প্রবৃত্তিজাত গুণে বশীভূত, সেই গুণই তাকে কর্ম করতে বাধ্য করায়।

যদি কেউ কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে (অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে) হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে মন দ্বারা বিষয়গুলি চিন্তা করে তবে সে মূঢ়, সে মিথ্যা আচরণকারী।

আর যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে, অনাসক্ত হয়ে (অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে) কর্মেন্দ্রিয়র সাহায্যে কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাই অর্জুন ! তুমি শাস্ত্রবিধিসম্মত কর্ম করো, কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। আবার কর্ম না করলে শরীরও নির্বাহ করা যায় না।' (গীতা ২।৩-৮)

নিষ্ঠা সম্বন্ধে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলছেন, মানুষের দুই প্রকার নিষ্ঠা থাকে, সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা (কর্মযোগ)—যা সাধকদের নিজ নিজ নিষ্ঠা। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ভগবৎনিষ্ঠা—যা সমগ্র গীতায় বলা হয়েছে। সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য এবং সাধকের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য নয়, তা একান্তই ভগবান ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল। আর জীব ও জগৎকে কেন্দ্র করে প্রথম দুটি নিষ্ঠা হয়ে থাকে। সাংখ্যযোগী 'আমি সংসার থেকে পৃথক' —এইরূপ অনুভব করেন এবং জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নিজস্বরূপে স্থিত হন। কর্মযোগী, শরীরাদি সংসারেরই অংশ বোধে, এ সবই সংসারের সেবায় ব্যয় করে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ভগবৎনিষ্ঠার সাধক কিন্তু প্রারম্ভেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে

ভগবানকে মেনে নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং পূর্ণরূপে শরণাগত হলেই তাঁর ঈশ্বরলাভ হয়।

কাউকে খারাপ বলে মনে না করলে, কারোর ক্ষতি না চাইলে, কারোর ক্ষতি না করলে 'কর্মযোগ' আরম্ভ হয়। আর আমার বলে কিছু নেই, আমার কিছু পাওয়ার নেই, আমার কিছু করার নেই—এই ভাব আসলে 'জ্ঞানযোগ' সাধনা আরম্ভ হয়।

কর্মের বিধি সম্বন্ধে ভগবান বলছেন যে, কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগীর সিদ্ধিলাভ বা নৈষ্কর্মসিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে না। সাংখ্যযোগীর সিদ্ধিলাভ হয় সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বভাব (অহং) ত্যাগ করলে। সাংখ্যযোগে কর্ম করা যায় আবার এক সীমার পরে কর্মত্যাগও করা যায় কিন্তু কর্মযোগীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য কর্ম করা অত্যাবশ্যক। কর্মযোগী সাধক কর্ম করেই নৈষ্কর্ম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন তার কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায়।

কর্ম কী ? সেই সম্বন্ধে ভগবান চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্লোকে বলছেন—

'শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ' (গীতা ১৮।১৫) অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক বা বাচিক আদি যে সমস্ত ক্রিয়া হয় তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলেই তা কর্ম হয় এবং বন্ধনের কারণ হয়, অন্যথায় নয়। অনেক মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে সন্তান পালনপোষণ, জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসা, চাকরি, অধ্যাপনা ইত্যাদিই কর্ম কিন্তু খাওয়াদাওয়া, শোওয়া-বসা, চিন্তা করা এগুলিকে তারা কর্ম বলে মনে করেন না। এটি এক মস্ত ভ্রান্তি, আসলে শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় স্থূল-শরীরের ক্রিয়া, ঘুমানো বা চিন্তা করা ইত্যাদি সূক্ষ্ম-শরীরের ক্রিয়া এবং সমাধি ইত্যাদি কারণ-শরীরের ক্রিয়া—এ সমস্তই হল কর্ম। যতক্ষণ দেহে অহংবোধ আর মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই তিন শরীর দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ক্রিয়ামাত্রই কর্ম। আর প্রকৃতির সঙ্গে (শরীরের প্রতি) এই একাত্মতা মেনে নেওয়ার ফলে তার কার্যসকল প্রকৃতিজাত গুণাদির অধীন হয়ে পড়ে **'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম'**। আর প্রকৃতির সমস্ত অবস্থার অতীত হলে হয় সহজ অবস্থা বা সহজ সমাধি। সহজাবস্থা হয় স্ব-স্বরূপের, যাতে বিন্দুমাত্র কর্ম নেই কর্মের কোনো সংস্কার পড়া সম্ভবও নয়।

সাংসারিক কর্ম, যাতে ভোগ হয় তা দুই প্রকারের হয়—বাহ্যভাবে ও মানসিকভাবে। আসক্তিপূর্বক বাহ্যভাবে ভোগ করা আর আসক্তিপূর্বক মানসিকভাবে ভোগের চিন্তা করা, উভয়েতেই অন্তঃকরণে একই সংস্কার পড়ে। কিন্তু মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন (সদসৎ বিবেকরহিত) মানুষ প্রায়ই বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির কর্ম হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে মনে মনে ওই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগ বিষয়সমূহ চিন্তা করে এবং নিজেকে ক্রিয়ারহিত বলে মনে করে। ভগবান এইরূপ ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বা মিথ্যা আচরণকারী বলে বলেছেন —**'মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে'**। অর্জুনও মানসিক ভাব পরিবর্তন না করে বাহ্যিকভাবে কর্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন — আমাকে এই ঘোরকর্মে নিযুক্ত করছেন কেন ? ভগবান বলছেন—যে ব্যক্তি অহং-কর্তৃত্ববোধ, মমত্ব, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পরিত্যাগ না করে শুধু বাহ্যভাবে কর্মত্যাগ করে তার আচরণ মিথ্যা অর্থাৎ সাধকদের বাস্তবে কর্মকে পরিত্যাগ না করে কামনা-বাসনারহিত হয়ে তৎপরতাপূর্বক সেগুলি পালন করা উচিত।

সাংখ্যযোগী অহং অর্থাৎ কর্তৃত্ব-ভাব পরিত্যাগে সচেষ্ট হন এবং কর্মযোগী ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্মে নিয়োজিত হন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগই অধিক সুগম মনে হয়। নিজ স্বার্থ ত্যাগপূর্বক পর হিতার্থে কর্ম করলে স্বতঃই অসঙ্গতা আসে। যিনি নিজের কল্যাণের (সুখভোগের নয়) আকাঙ্ক্ষা করেন, যার স্বভাবে উদারতা আর হৃদয়ে করুণা থাকে অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখী (আনন্দিত) এবং দুঃখে দুঃখী ভাব থাকে তিনিই কর্মযোগের অধিকারী আর সেই কর্মযোগীর কর্মবন্ধন সহজেই দূর হয় (গীতা ৫।৩)।

কর্মযোগের অধিকারী সাধক দুই প্রকারের হয়—

১) যাঁর মধ্যে কর্ম করার আগ্রহ, আসক্তি এবং রুচি আছে কিন্তু নিজ কল্যাণের ইচ্ছাই প্রধান, এইরূপ সাধকের নতুন নতুন কর্ম আরম্ভ (সেবামূলক কাজ) করার প্রয়োজন নেই। তাঁর শুধুমাত্র প্রাপ্ত পরিস্থিতিরই সদুপযোগ করা উচিত।

২) যাঁর মধ্যে নিজ কল্যাণের ইচ্ছা থেকেও সকলকে সেবা করার, সকলকে সুখী করার, সমাজ সংস্কারের ইচ্ছার আগ্রহ অধিক থাকে তিনি নতুন নতুন সেবামূলক কর্ম শুরু করতে পারেন। তবে নতুন কর্ম কেবলমাত্র তাঁর কর্ম করার আসক্তি মেটানোর জন্যই করা উচিত।

যেহেতু অর্জুনের মনে নিজ কল্যাণের জন্য ইচ্ছাই প্রধান ছিল (**যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে** —(গীতা ২।৭), **যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্**—(গীতা ৩।২)। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বনপূর্বক ধর্মযুদ্ধই করতে বলেছেন।

ভগবান এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে বলেছেন—**'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ'** (গীতা ৩।৮) অর্থাৎ কর্ম করা, কর্ম না করার থেকে শ্রেষ্ঠ। কর্তব্যকর্মে অমনযোগী ব্যক্তি প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রাদিতে নিজ অমূল্য সময় নষ্ট করে নিজ পতন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে ভগবান আগেও বলেছেন—**'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** (গীতা ২।৪৭) অর্থাৎ যেমন তোমার কর্মফলেচ্ছা না থাকে তেমনি আবার কর্ম না করাতেও যেন আসক্তি না হয় অর্থাৎ রজোগুণ দূর করো, তমোগুণ দূর করো। কর্ম সম্বন্ধে এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে —**'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'** অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিসম্পন্ন নিয়ত কর্মই করবে যাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রবিধিসম্পন্ন বিহিত কর্ম হল ব্রত-উপবাস-উপাসনা ইত্যাদি। বিহিত কর্মের মধ্যে বর্ণ-আশ্রমের ক্ষেত্রে যা বিশেষরূপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটি হল **'নিয়ত কর্ম'**। যেমন ন্যায়ভাবে খাদ্যগ্রহণ, জীবিকা অনুযায়ী কাজ বা ব্যবসা, পথভ্রান্ত ব্যক্তিকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

বিহিত কর্মের পালন অপেক্ষাও নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ যথা মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, হিংসা না করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আর নিষিদ্ধকর্ম ত্যাগ হলেই বিহিত কর্ম স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে।

নিয়ত কর্ম হল প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মই। ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন —**'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি'** (গীতা ২।৩১) অর্থাৎ স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া তোমার একেবারেই উচিত নয়। যদিও অর্জুনের

মতো দুর্যোধনেরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে বর্ণ ও ধর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম কিন্তু এরা অন্যায়ভাবে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাইছে তাই এই যুদ্ধ তাদের পক্ষে নিয়ত বা ধর্মযুক্ত কর্ম নয়।

জ্ঞানযোগে যেমন বিবেক সহকারে সংসার থেকে বন্ধন ছিন্ন হয় তেমনি কর্মযোগের দ্বারা সঠিকভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করলে সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যায়। তবে সাধকেরা প্রায়শই দুটি ভুল করে থাকেন। তাঁরা যত্ন সহকারে সাধনভজন করেন কিন্তু তা নিজেদের পছন্দমতো পরিস্থিতি, অনুকূলতা ও সুখবুদ্ধি বজায় রেখে করতে চান যা সাধনের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। যে সাধক তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে সুগমতার ইচ্ছা করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখেরই অনুরাগী, ভগবৎপ্রেমের নয়।

'মনস্বী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্' (ভর্তৃহরিনীতিশতক)

আবার সাধক অনেক সময় শীঘ্র তত্ত্বপ্রাপ্তি চান। এই সব সাধকদের সহজভাবে ও শীঘ্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা থাকায় তাঁদের দৃষ্টি সাধনার দিকে না গিয়ে ফলের দিকে যায়। এর ফলে সাধনে বিঘ্ন ঘটে, কঠোরতা সহ্য করতে হয় এবং সাধ্যপ্রাপ্তিতেও বিলম্ব ঘটে।

উৎকণ্ঠা এক জিনিস ও শীঘ্র পাওয়ার আশা অন্য ব্যাপার। আসক্তিযুক্ত সাধক সাধনাতে সুখভোগ করেন, তত্ত্বপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে ক্রোধান্বিত হন এবং সাধনার দোষ দেখেন। কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেমযুক্ত সাধক সাধনে বিঘ্ন বা বিলম্ব হলে আর্তভাবে ক্রন্দন করেন এবং তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁর সাধনের ভাব আরও গাঢ় হয়।

তাই ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে, সাধক যেন অনুকূল এবং সুখবুদ্ধি (যা সাধনের প্রধান বাধা) ত্যাগ করে তৎপরতার সঙ্গে কর্তব্যকর্মে মনোনিবেশ করেন।

কর্মবিধি—নিষ্কাম কর্ম (যজ্ঞ)—(শ্লোক ৯—১৬)

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

(গীতা ৩।৯—১৬)

'যজ্ঞের (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি ব্যতীত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়। তাই আসক্তি বর্জিত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করা উচিত।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তব্যকর্মের বিধানসহ প্রজা (মানুষ প্রমুখ) সৃষ্টি করেন এবং তাদের (প্রধানত মানুষকে) বলেন, তোমরা এই কর্তব্য রূপ যজ্ঞ দ্বারা সকলের সমৃদ্ধি করো এবং এই যজ্ঞই তোমাদের কর্তব্যপালনের অভিষ্ট সামগ্রী প্রদান করুক।

তোমার এই কর্তব্য (যজ্ঞ) দ্বারা দেবতাদের (সব প্রাণীকে) সংবর্ধনা (উন্নত) করো এবং দেবতাগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন (সংবর্ধনা) করুন। এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট (সংবর্ধিত) দেবগণ (বিনা প্রার্থনাতেই) তোমাদের কর্তব্যকর্মের নিমিত্ত আবশ্যক সামগ্রী প্রদান করে যাবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্মের এই সামগ্রী অন্যের সেবায় ব্যয় না করে স্বয়ং ভোগ

করে সে অবশ্যই তস্কর।

যজ্ঞাবশেষ (যোগ) অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু যারা নিজেদের জন্য কর্ম করেন তারা পাপী, তারা পাপরাশিই ভক্ষণ করে থাকেন।

সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় অন্ন থেকে, আর অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘ (জল) থেকে, মেঘ জন্মায় যজ্ঞ থেকে এবং যজ্ঞ সম্ভব হয় নিষ্কাম কর্ম থেকে।

বেদ থেকে উৎপন্ন হয় কর্ম এবং বেদ প্রকটিত হয় পরব্রহ্ম থেকে। সেইজন্য সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

যে ব্যক্তি ইহলোকে এই পরম্পরা দ্বারা অনুমোদিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয়াসক্ত সেই পাপাচারী বৃথাই জীবনধারণ করে।' (গীতা ৩।৯-১৬)

গীতা অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, তীর্থভ্রমণ, ব্রত, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিই যজ্ঞ। কর্তব্য মনে করে চাকরি, ব্যবসা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিও যজ্ঞ। আবার অপরের সুখের জন্য বা তাদের হিতের উদ্দেশ্যে যে কর্মগুলি করা হয় সেগুলি সবই যজ্ঞার্থ কর্ম।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্থিতি হয় তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী, ক্রিয়া অনুযায়ী নয়। যজ্ঞার্থ কর্ম করার কালে কর্মযোগীর স্থিতি, উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মার প্রতি, তাই কর্মের বৃত্তি সমাপ্ত হলেই তার সেই বৃত্তি পরমাত্মার দিকেই চলে যায়। আর নিজের জন্য কর্ম করলে সকাম ভাব থাকে এবং সকাম ভাব থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। যতপ্রকার সকাম বা নিষিদ্ধ কর্ম আছে বা যা কিছু সুখ-মান-অহংকার আরাম ইত্যাদির জন্য করা হয় সবই **'অন্যত্র কর্ম'** ও বন্ধনকারী।

মানুষ সাধারণত কর্তব্যকর্ম করতে পরাঙ্মুখ হয় দুটি কারণে—(১) সে ফল কামনা করে কর্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু যখন বলা হয় কামনা করা উচিত নয় তখন ভাবে তাহলে কর্ম করব কেন ? (২) কর্ম আরম্ভ করলে যখন দেখে তার ইচ্ছেমতন ফল হচ্ছে না তখন ভাবে উত্তম কর্ম করেও যদি বিপরীত ফল

হয় তবে কর্ম করব কেন ?

কর্মযোগীর কিন্তু কোনো কামনা থাকে না, তিনি কোনো বিনাশশীল ফলও আশা করেন না। তিনি সংসারের হিতার্থে কর্তব্যকর্ম করে যান মাত্র, তাই তাঁর কর্মে শৈথিল্য আসে না। মানুষ কর্ম করলে আবদ্ধ হয় না, *অন্যত্র কর্ম* করলেই আবদ্ধ হয়—তাই নিজের জন্য কিছু করা উচিত নয়। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে তার রক্ষায় সদা তৎপর থাকেন এবং সর্বদা প্রজার হিতের কথা চিন্তা করেন, সেইজন্য তাঁকে 'প্রজাপতি' বলা হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতেই মানুষকে নির্দেশ দেন—'তোমরা নিজেদের কর্তব্যপালন দ্বারা সবকিছুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করো, তাহলে তোমরাও কর্তব্যকর্ম করার উপযোগী সামগ্রী পেতে থাকবে, তার কোনো অভাব হবে না। কর্মযোগী অপরের সেবা বা মঙ্গল বিধানের জন্য সদাই তৎপর থাকেন, তাই ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী তাঁর অন্যের সেবা করার সামগ্রী, সামর্থ্য ও শরীর-নির্বাহের বস্তুগুলোর কখনো অভাব হয় না। তিনি এসব সহজেই এবং পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হতে থাকেন, ইহাদের কখনই স্বল্পমাত্রায় প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মার বিধান অলঙ্ঘনীয়।

সাংসারিক সম্পর্কজনিত ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু আশা করা এবং তাদের ওপর অধিকার ফলানো মস্ত বড় ভুল। চিন্তা করা উচিত আমরা তাঁদের কাছে ঋণী এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্যই আমাদের এইস্থানে জন্ম হয়েছে। এই ভাব নিয়ে সেবা সকলেরই করা উচিত, কিন্তু যারা আমাদের ওপর নির্ভরশীল সর্বাগ্রে তাদের সেবা করা কর্তব্য। সকলের প্রতি সেবামূলক ভাব রেখে নিজ কর্তব্য পালন করতে হয় তাতে অন্যার অধিকার রক্ষিত হয়, ইহাই কর্মযোগ। অন্যদিকে অন্যের কর্তব্য দেখার অধিকার আমাদের নেই। অন্যের কর্তব্যাদিতে লক্ষ রেখে নিজ অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করলে তা মহা পতনের কারণ হয়। বর্তমানে গৃহে, সমাজে যে অশান্তি তার মূল কারণ সকলেই নিজ কর্তব্যপালনে বিমুখ কিন্তু অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। সকলের প্রতি সেবারূপ কর্তব্যপালন করলে তা পরম কল্যাণকারী হয় এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। যেমন কারোর গচ্ছিত জিনিস

ফেরত দিলে সেই বস্তু ও সেই ব্যক্তি উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এই সম্পর্ক ছিন্নতাই চিন্ময়তার অনুভব করায়।

চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে দেবতা, প্রাণী, বৃক্ষ সবই হল ভোগযোনি কেবল মানুষই কর্মযোনি। ব্রহ্মা মানুষকে দেবতার সঙ্গে পরস্পরের হিতের কথা বলেছেন, কিন্তু দেবতা অর্থে বুঝতে হবে যে চারবর্ণের মানুষ এবং তারা যদি পরস্পরের হিতের জন্য কর্ম করে তবে সকলেরই পরম কল্যাণ লাভ হবে। সম্পূর্ণ জগৎ এমনভাবে সৃষ্টি যে কোনো কিছুই (সে বস্তুই হোক বা ক্রিয়াই হোক) নিজের জন্য নয়, সবই অন্যের জন্য—**'ইদং ব্রহ্মণে ন মম'**। স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষকে সুখপ্রদান করে, স্ত্রীলোককে নয়। পুরুষঅঙ্গ নারীকে সুখ প্রদান করে, পুরুষকে নয়। মায়ের দুধ শিশুর জন্য, নিজের জন্য নয়। শ্রোতা বক্তার কথা শোনার জন্য এবং বক্তা শ্রোতাকে শোনানোর জন্যই হয়, নিজের জন্য নয়। এজগতের সৃষ্টি ভোগের জন্য নয়, নিজেকে উদ্ধারের জন্য। নিজে সুখ গ্রহণ না করে অপরকে সুখ প্রদানই প্রধান কর্তব্য।

এখানে প্রশ্ন হল অন্যের ভালো করলেও সে যদি খারাপ করতে থাকে তবে কী হবে ? এর উত্তর হল, কারোর ভালো করলে তার খারাপ করার সামর্থ্যই থাকে না। কিন্তু যদি তেমন কিছু ঘটে তবে তার জন্য সে পরে দুঃখ পাবে বা অপর কেউ হাজির হয়ে তাকে নিবারণ করবে। **'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'** গীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ, ইহা ব্রহ্মার বাণী, পরম মানবতার বাণী—ইহা অলঙ্ঘনীয়।

ভগবান বলছেন **'দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ'** অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম বা যজ্ঞরূপে কর্ম করলে দেবতারাও তার অধিকার হিসেবে মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে থাকেন। এ জগতে মানুষের সৃষ্টি ও পালন পিতামাতার কাছ থেকে, বিদ্যালাভ গুরুস্থানীয়দের থেকে, ঋষিগণ প্রদান করেন জ্ঞান, দেবগণ দেন কর্তব্য-পালনের বস্তুসমূহ ; পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি অপরের সেবায় থাকে সদা তৎপর (যদিও এটা হয় স্বতঃই, বুদ্ধি বা বোধযুক্ত হয়ে নয়) এইভাবে মানুষের জীবন ঋণে ঋণময়। এই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই পঞ্চযজ্ঞের বিধান (ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ,

ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ) এবং একমাত্র মানুষই পারে বুদ্ধিপূর্বক ঋণ পরিশোধ করতে, **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হতে।

তবে সেবকের অনেক সময় এই ভুল হয় যে আমি সেবা করছি, আমি জিনিস প্রদান করছি, মনে এই ভাব আসা। আসলে মানুষের মনে এই ভাব থাকা উচিত যে যাকে সেবা করছি তার ঋণ পরিশোধ করছি, তার বস্তুই তাকে প্রদান করছি। নিজের গ্রহণ করার ভাব ত্যাগ করে দেবগণের মতো অপরকে সুখী করার ভাবই মানুষের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি অপরকে না দিয়ে নিজেই সমস্ত ভোগ করে, সে তো চোর বটেই পরন্তু যে ব্যক্তি অপরকে সেবা করে মান, যশ ইত্যাদি কিনতে চায় সেও অংশত চোর। এইরূপ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কখনো শুদ্ধ ও শান্ত হয় না।

এই ব্যষ্টি (নিজের) শরীর কোনোভাবেই সমষ্টি জগৎ থেকে পৃথক নয় আর পৃথক হওয়া সম্ভবও নয়। সমষ্টির অংশকেই ব্যষ্টি বলে আর ব্যষ্টিকে (শরীরকে) নিজের বলে মনে করা আর সমষ্টিকে (জগৎকে) পৃথক ভাবাই হল রাগ-দ্বেষাদির মূল এবং এটিই হল অহংভাব বা আমিত্ব, যা বৈষম্য সৃষ্টি করে। কর্মযোগ পালন করলে এই সব রাগ-দ্বেষাদি সহজেই দূরীভূত হয় কারণ কর্মযোগীর এই ভাব থাকে যে, যা কিছু করেছি নিজের জন্য নয়, জগৎ-সংসারের জন্য। রাজা জনক কর্মযোগী ছিলেন, মহাভারতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে রাজা জনক বলছেন—

'আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী মম।'

(মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব ৩২।১১)

অর্থাৎ এই দেহটি আমার নয় অথবা সমগ্র সৃষ্টিই আমার দেহ।

তাৎপর্য এই যে হয় ব্যষ্টিদেহ (শরীরকে) আমার নয় ভাবা (জ্ঞানযোগ) অথবা সমষ্টি দেহ নিজের বলে ভাবা (কর্মযোগ)।

এখন বক্তব্য এই যে যদি প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রী সবই অপরের সেবায় নিযুক্ত করা যায় তবে কর্মযোগীর জীবন নির্বাহ হবে কীভাবে ? আসলে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম অন্যের সেবার্থে হয়ে থাকে, তার অন্তরে জগতের কোনো কিছুরই প্রয়োজন বোধ থাকে না, তাই জগতেরই তাঁকে প্রয়োজন হয়। তাঁর জীবন-

নির্বাহর ব্যবস্থা জগৎ নিজেই করে দেয়। ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান 'কর্মযোগী' ও 'ভোগী' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—**'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ'** অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে কর্ম শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার মধ্যে যোগ অর্থাৎ সমতা রয়ে যায় আর এই সমত্ব অনুভব হলে তার সমস্ত কর্ম তা পাপ বা পুণ্যরূপেই হোক বা সঞ্চিত, প্রারব্ধ বা ক্রিয়মানরূপে হোক, বিলীন হয়ে যায়। আর ভোগীরা—**'ভুঞ্জতে ত্বে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'** অর্থাৎ নিজের জন্য স্বার্থ, কামনা, মমতা, আসক্তি সহকারে কর্ম করলে সে পাপী বলে গণ্য হয় আর তার অর্জিত পাপ চুরাশি লক্ষ যোনি বা নরকে ভোগ করলেও শেষ হয় না।

মনুষ্য জন্ম এমন এক অদ্ভুত কৃষিক্ষেত্র যেখানে পাপ বা পুণ্য—যে বীজই রোপণ করা হোক না কেন তা বহু জন্ম পর্যন্ত ফল দেয়। তাই সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

মনরে ! কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জীবন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

তাই মানুষের শরীর, তার যোগ্যতা, পদ, অধিকার, বিদ্যা, বল ইত্যাদি যা কিছু আছে তা তার নিজের জন্য নয়, অন্যের সেবার জন্য ব্যয় করা উচিত এবং এটিই হল আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা।

পরবর্তী দুটি শ্লোকে (১৪, ১৫) ভগবান সৃষ্টিচক্রে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভগবান বলেছেন—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি—প্রাণী অন্নময়। যে প্রাণীর যা খাদ্য এবং যা গ্রহণ করলে শরীরের উৎপত্তি, পোষণ এবং পুষ্টি হয় তাই তার কাছে অন্ন।

অন্নাদ্ধ্যৈব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি॥

(তৈতিরীয় উপনিষদ্ ৩।২)

পর্যন্যাদন্নসম্ভবঃ—সমস্ত খাদ্যপদার্থের উৎপত্তি জল থেকে। ঘাস-পাতা, ফুল, ফল, সবজি সবই জল থেকে হয়। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ আদি জীবন নির্বাহের সমস্ত বস্তুই স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বৃষ্টিপাত হল

জলের আধার। তাই বলা হয়েছে বৃষ্টির জন্যই অন্ন সম্ভব হয়।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ—গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যজ্ঞ শব্দটি প্রধানত কর্তব্যকর্মবাচক যাতে ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। নিষ্কামভাবে করা ত্যাগমূলক সমস্ত লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্মই হল যজ্ঞ। যজ্ঞ শব্দটি হোম, দান, পদ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মও সূচিত করে। তবে সমস্ত কর্মের মধ্যেই কামনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য, স্বার্থপরতা, অহং-অভিমান ইত্যাদি বিষের মতন বিদ্যমান থাকে। বৈদ্য যেমন বিভিন্ন তীব্র বিষকে শোধন করে ওষুধরূপে প্রদান করে, তখন তা অমৃতের ন্যায় কাজ করে কঠিন অসুখ দূর করে দেয়, সেইরকম কর্মেরও কামরূপ বিষাক্ত অংশ নষ্ট করে নিষ্কাম ভাব আর তখন সেই কর্মই অমৃতময় হয়ে জন্ম-মরণরূপ মহৎ রোগ দূর করে দেয়। এইরূপ **অমৃতময় নিষ্কাম কর্মকেই যজ্ঞ বলে।**

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মার একটি উপদেশ কথিত আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ ও অসুর—এই তিনপ্রকার সৃষ্টি করে তাদের এক অক্ষররূপী 'দ' উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাদের নিকট ভোগসামগ্রীর আধিক্য থাকায় ও তারা ভোগপ্রধান হওয়ায় 'দ'-এর অর্থ ধরে নিলেন 'দম্য' অর্থাৎ দমন করো (ইন্দ্রিয় দমন)। মানুষেরা সাধারণত লোভী, তাদের সংগ্রহ প্রবৃত্তি বেশি, তাই তারা 'দ'-এর অর্থ করল 'দত্ত' অর্থাৎ 'দান করো' হিসাবে। অসুরেরা নিষ্ঠুর, অপরকে নির্যাতনের প্রবৃত্তি বেশি, তাই তারা 'দ'-এর অর্থ ধরে নিল 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ 'দয়া করো' বলে। এইরূপে দেবতা, মানুষ ও অসুর—তিনজনকে দেওয়া উপদেশই হল সংযম করা এবং নিজের কর্তব্যকর্ম দ্বারা অপরের হিত করা। বর্ষার সময় মেঘের যে 'দ-দ-দ' গর্জন তা আজও কর্তব্যকর্মরূপে ব্রহ্মার উপদেশ (দম্য, দত্ত, দয়ধ্বম্) স্মরণ করিয়ে দেয় (বৃহদারণ্যক ৫।২।১-৩)।

কিন্তু নিজের কর্তব্য-পালনে বৃষ্টি হওয়া কীরূপে সম্ভব ? বাক্য থেকে আচরণের প্রভাব বেশি। মানুষ নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করলে প্রকৃতির নিয়ম পালন করা হয় এবং এতে **'দেবান্ ভাবয়তনেন'** অর্থাৎ দেবতারা সংবর্ধিত হন, সন্তুষ্ট হন। আর এর ফলে দেবতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে

'তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ' অর্থাৎ মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে দেবতারাও তাঁদের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হন, বৃষ্টিপাত করান।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—ব্রহ্মপদ এখানে বেদের বাচক আর মানুষের কর্তব্যকর্ম পালনের জ্ঞান (বা যজ্ঞ) বেদই নির্দেশ করে—**'এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মনো মুখে'** (গীতা ৪।৩২)।

ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্—পরমাত্মা থেকে বেদ প্রকটিত হয় তাই পরমাত্মাই এই সমস্ত কিছুর মূল। তাহলে সৃষ্টিচক্রের মূলসূত্র হচ্ছে—পরমাত্মা হতে বেদ প্রকটিত হয় এবং তা কর্তব্যপালনের নিয়মাবলি ব্যক্ত করে। মানুষ যদি সেই কর্তব্য বিধিপূর্বক পালন করে তবে সেই কর্তব্যপালন রূপ যজ্ঞ করার ফলে তা থেকে বৃষ্টি হয়। বর্ষা হলে অন্ন জন্মায় এবং তা প্রাণী সৃষ্টির মূল কারণ। এইভাবে প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ করে সৃষ্টিচক্র অব্যাহত রাখে। তাই বলা হয়েছে **'সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'**। মানুষ ছাড়া অন্য স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের দ্বারাও পরোপকার (যজ্ঞ) হয় কিন্তু তা স্বতঃই হতে থাকে কিন্তু একমাত্র মানুষই এমন, যে বুদ্ধি সহযোগে যজ্ঞ করতে পারে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁকে কেবল যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হচ্ছে কেন ? এর উত্তর এই যে পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে নিত্য বিদ্যমান হলেও যজ্ঞ হচ্ছে তাঁর উপলব্ধি স্থান। যেমন ভূমিতে সর্বত্র জল থাকলেও কূপাদিতে তা উপলব্ধ হয়, সর্বত্র নয়। পাইপে সর্বত্র জল থাকলেও একমাত্র কলের মুখেই বা ছিদ্র থেকেই তা পাওয়া যায়, অন্যত্র নয় ; সেইরকম যজ্ঞ ব্যতীত নিজের জন্য কর্ম করলে বা জড়ের (শরীরাদির) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বাধা আসে, উপলব্ধি হয় না। সৃষ্টিচক্র অনুসারে নিজ কর্তব্যপালন করার দায় মানুষের। ভগবান এই প্রকরণ শেষ করেছেন সেইসব মানুষকে তিরস্কার করে যারা কর্তব্যপালন না করে সৃষ্টিচক্রে বাধা হয়ে ওঠে। জগৎ এবং শরীর (ব্যক্তি) দুটি বিজাতীয় বস্তু নয়। যেমন শরীরের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, সেইরকম জগতের সঙ্গে

ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে জগতের সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। কোনো ব্যক্তি যদি শরীরকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, অর্থাৎ জগতের অংশ ভাবে এবং শরীরের প্রতি বিশেষ কামনা, বাসনা, মমত্ব, অহং-কর্তৃত্ববোধ পরিত্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালন করে তবে জগৎ স্বতঃই সুখী হয়। যেমন রথের চাকার একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি ভেঙে যায় তবে তাতে সমস্ত রথটি ও আরোহীদের আঘাত লাগে, তেমনি যদি কোনো ব্যক্তি কামনাবাসনা যুক্ত করে কর্ম করে, তবে তা সৃষ্টিচক্রের সুষ্ঠু সঞ্চালনে বাধা উৎপাদন করে থাকে। ভগবান এইসব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলছেন **'স্তেন এব সঃ'** (গীতা ৩।১২) অর্থাৎ তারা চোর, **'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা'** (গীতা ৩।১৩) অর্থাৎ তারা পাপ ভক্ষণ করে, **'অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারামঃ'** (গীতা ৩।১৬) অর্থাৎ এই ভোগাসক্ত ব্যক্তিদের জীবন পাপময় হয় ইত্যাদি।

ভগবানের ও মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—লোকসংগ্রহ (১৭-২৬)

আগের প্রকরণে ভগবান কর্তব্যে অবহেলাকারীদের বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে জানিয়েছেন—**'মোঘং পার্থ স জীবতি'** (গীতা ৩।১৬)। আর এই প্রকরণে ভগবান বলছেন সিদ্ধ মহাপুরুষ যদি কর্তব্যকর্ম নাও করেন তবু তাঁর বেঁচে থাকা তো অর্থহীন নয়ই বরং তা পরম সার্থক।

(ক) ভগবানের কর্মনিষ্ঠা—(শ্লোক ২২-২৪)

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

(গীতা ৩।২২-২৪)

'ভগবান বলছেন— হে পার্থ ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই আর কোনো প্রাপ্তিযোগ্য বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই। তবুও আমি কর্তব্যকর্মে ব্যাপৃত আছি।

আমি যদি সাবধানতাপূর্বক কর্ম না করি তবে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে।

আর এর ফলে মানবকুল পথভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসংকরাদির হেতু এবং সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব।' (গীতা ৩।২২-২৪)

এই জগতের রচনা জীবমাত্রেরই উদ্ধারের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য কর্মের ফল স্বর্গবাস ও পাপকর্মের ফল নরকবাস ও চুরাশি লক্ষ জন্ম হয়ে থাকে। পুণ্য ও পাপ—এই দুইয়েরই ঊর্ধ্বে উঠে নিজ কল্যাণের জন্য কর্ম করাই হল মনুষ্যজন্মর সার্থকতা।

যদি কোনো কর্মের কথা বারে বারে স্মরণে আসে, তবে বুঝতে হবে সেই কর্মটি থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়নি ; কর্মের প্রতি মমতা, আসক্তি রয়ে গেছে। আসক্তিরহিত হয়ে কর্তব্য পালন সম্বন্ধে ভগবান বলছেন—**'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশঃ'** অর্থাৎ আমার পথ অনুসরণকারীগণই বাস্তবিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত। যারা আমার আদর্শ না মেনে আলস্য ও প্রমাদবশত কর্তব্যকর্ম না করে শুধু অধিকার আকাঙ্ক্ষা করে, তারা আকৃতিগতভাবে মানুষ হলেও মনুষ্য পদবাচ্য নয়। জগৎ-সংসারে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত তা জানাবার জন্যই ভগবান অবতাররূপে অবতরণ করেন। **জগৎসংসারে নিজের জন্য থাকা উচিত নয়—এই হল জগৎ-সংসারে থাকার বিদ্যা।**

নিজের জন্য কোনো কর্তব্যকর্ম না থাকলেও ভগবান অপরের হিতার্থে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধুজনের উদ্ধার, পাপীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য কর্ম করে থাকেন। গীতায় বলা হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৮)

মহাভারতেও ভগবান উতঙ্ক ঋষিকে ত্রিলোক্যে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলছেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।
তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব॥

(মহাভারত, অশ্বা. ৫৪।১৩-১৪)

'আমি ধর্মের রক্ষা এবং স্থাপনার নিমিত্ত ত্রিলোক্যে নানা যোনিতে অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও আকৃতি অনুসারে ব্যবহারও করি।'

ভগবান সর্বদা কর্তব্যপরায়ণ থাকেন, কখনো কর্তব্যচ্যুত হন না। সুতরাং ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও কখনো কর্তব্যচ্যুত হওয়া উচিত নয়। কর্তব্যচ্যুত হলেই তিনি ভগবৎতত্ত্ব অনুভব থেকে বঞ্চিত হন। সর্বদা নিষ্কামভাবে কর্তব্যপরায়ণ হলে সাধকের ভগবৎতত্ত্বর অনুভব অতি সহজেই হওয়া সম্ভব।

(খ) মহাপুরুষের কর্মনিষ্ঠা—(শ্লোক ১৭-২১, ২৫-২৬)

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।১৭-২১)

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

(গীতা ৩।২৫-২৬)

'যে ব্যক্তি নিজেতেই প্রীতি, নিজেতেই তৃপ্ত, নিজেতেই সন্তুষ্ট তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না।

সেই কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো

প্রয়োজন নেই, কর্ম থেকে বিরত থাকারও প্রয়োজন নেই। প্রাণীদের সঙ্গেও তাঁর কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না।

তাই সর্বদা আসক্তিশূন্য হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করা উচিত কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করে।

রাজা জনকের মতো মহাত্মাগণও কর্ম দ্বারাই পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে সকলেরই নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাই অনুসরণ করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য বলে ধরেন, সাধারণ মানুষেরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে। (গীতা ৩।১৭-২১)

কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম করে, আসক্তিবর্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্থে সেরূপ কর্ম করা উচিত।

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ সর্বদা সতর্ক থেকে অনাসক্তভাবে কর্ম করবেন যাতে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রম না হয় এবং তাদেরও কর্মে প্রবৃত্তি হয়।' (গীতা ৩।২৫-২৬)

অনাসক্তভাবে কর্ম—কোনো ব্যক্তিরই সাংসারিক প্রীতি চিরকাল থাকতে পারে না। সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টির কেবল প্রতীতিই জন্মায় কিন্তু তা টিকে থাকে না। তবে বিনাশশীল বস্তুর ওপর আসক্তি আসে কেন ? মানুষ যখন আকাঙ্ক্ষাকৃত বস্তু (ধনাদি) প্রাপ্ত হয় তখন কামনা মিটে যায় এবং অন্য আকাঙ্ক্ষা আসার পূর্বে তার নিষ্কামভাব আসে। এই অবস্থায় সে নিষ্কামতার সুখ অনুভব করে। কিন্তু সেই সুখকে মানুষ ভুল করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তিজনিত সুখ বলে মনে করে এবং সেটিকেই প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি নামে অভিহিত করে। এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, সাধক নিষ্কামতাকে সুখের মূল কারণ বলে মনে করেন এবং কামনাকে মনে করেন দুঃখের কারণ হিসাবে। অপরদিকে সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বস্তুগুলি প্রাপ্তিকেই সুখ বলে মনে করেন এবংঅপ্রাপ্তিকেই দুঃখ বলে মনে করেন। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণও যদি সাধকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে

দেখেন এবং তদনুসারে চিন্তা করেন তাহলে তারাও শীঘ্রই নিষ্কামতা লাভ করবেন।

সকাম ব্যক্তিদের কর্মযোগের অধিকারী বলা হয়েছে। **'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'** (ভাগবত ১১।২০।৭)। সকাম ব্যক্তি কর্মযোগে রত হলে এঁদের প্রীতি ও তৃপ্তি সংসারের প্রতি না হয়ে আত্মস্বরূপের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে। সংসারে আসক্ত ব্যক্তির যখন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে তখনই কর্ম করে থাকে, কিন্তু কর্মযোগী মহাপুরুষদের কোনো কিছুর পাওয়ার থাকে না তাই তাদের কর্মই বা কী থাকে ? অবশ্য **'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'** (গীতা ৩।১৭) পদটির মানে এই নয় যে এইসব মহাপুরুষের দ্বারা কোনো কর্ম হয় না। সাংসারিক কাজের জন্য কোনো তাগাদা না থাকলেও লোকসংগ্রহের জন্য তাঁদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কর্মযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলছেন—জগতে তাঁদের কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো'**, কর্ম থেকে তাঁদের বিরত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই **'নাকৃতেনেহ কশ্চন'** এবং প্রাণীদের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থেরও কোনো সম্পর্ক থাকে না **'ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ'**।

মানুষের জাগতিক বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই কাল হয়ে তার বন্ধনের কারণ হয়। সেই ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্যই কর্তব্যকর্ম করার প্রয়োজন থাকে। সাধারণ মানুষ নিজ কামনা পূরণের জন্য কর্ম করে, কর্মযোগী নিজ কামনা নিবৃত্তের জন্য পরের হিতে কর্ম করেন আর কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কোনো কামনা না থাকায় তাঁদের কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তাও থাকে না কিন্তু তাঁদের দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে কৃত সকল কর্মই স্বতঃই সৃষ্টির হিতের জন্য হয়ে থাকে। জগৎ থেকে প্রাপ্ত বস্তু বা কর্মসামগ্রী কখনই ব্যষ্টির (নিজ শরীর) জন্য নয়, সমষ্টির (জগৎ-সংসারের) জন্য হয়ে থাকে। মানুষ ভুল করে ব্যষ্টির জন্য সমষ্টিকে ব্যবহার করে অশান্তি পায়, ঘোর শাস্তি ভোগ করে। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজেদের জন্য কথিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সবই জগৎ-সংসারের হিতের জন্য ব্যবহার করেন তাই তাঁদের দ্বারা

কৃত কর্মে নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তাঁদের সকল কর্মই আদর্শস্বরূপ উত্তম কর্মে পরিগণিত হয়।

নিজের প্রয়োজনে কর্ম করলে কখনোই তা আদর্শ হয় না। যে সব ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন তারা রজগুণী, তাই তারা নিজ আত্মগরিমার জন্য কর্ম করলেও কখনোই অপরের জন্য কর্ম করতে চান না। সেইরকম তমোগুণী পুরুষ আলস্য, প্রমাদাদিতে আসক্ত, তাই তারাও অপরের জন্য কর্ম করতে চান না। কিন্তু কর্মযোগ সিদ্ধ মহাপুরুষ সাত্ত্বিক সুখেরও ঊর্ধ্বে, তাই তাঁদের সাত্ত্বিক সুখেও প্রবৃত্তি থাকে না। শরীরাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকায় তাঁদের না থাকে আত্মগরিমা, না আলস্য বা আরামের প্রতি দৃষ্টি। তাঁদের জগতের কাছ থেকে না থাকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছে, না প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ততা বা মৃত্যুভয়। তাই তাঁদের দ্বারা নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম স্বতঃই হতে থাকে। একে সহজ-অবস্থা বলে।

উত্তমা সহজবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাঽধমাঽধমা॥

জীব যখন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, তখন সে শরীর, অর্থ, জমি, বাড়ি ইত্যাদি সামগ্রী পেয়ে থাকে জগৎ-সংসারে কর্ম করার জন্য। এগুলি সবই কিন্তু ইহলোক ত্যাগের সময় পরিত্যক্ত হয়। যেমন মানুষ কোনো জায়গায় (অফিসে) কাজ পেলে সে চেয়ার, টেবিল, কাগজপত্র ইত্যাদি অফিস থেকেই পায় অফিসের কাজের জন্য, নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। অফিসে কাজের বিনিময়ে সে বেতন পায় এবং নির্লোভ হয়ে ভালোভাবে কাজ করলে তার পদোন্নতি হয়। সেইরকম কেউ যদি জগৎ-সংসারের বস্তু দিয়ে সংসারের সেবা করে তার জগতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বিনিময়ে সে শুভসংস্কার প্রাপ্ত হয় যা তাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি করায়।

মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকরা কর্তব্য মনে করে যাত্রীদের সেবা করে, পরিবর্তে কিছু আশা করে না তাই তাদের মেলা অন্তে কোনো লাভ লোকসানের হিসেব থাকে না আর মেলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

কর্মযোগী সাধকও এইভাবে কাজ করবেন ; বস্তু, সম্মান, মর্যাদা কিছুর আশা না রেখে তিনি জগৎ-সংসারের সেবা করবেন ফলে জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে।

কর্মযোগী কেবল নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনকালেই নিজেকে কর্তা ভাবেন, অন্য সময় নয়। এ যেন নাটকের চরিত্রাভিনয়। নির্দিষ্ট ক্রিয়াটুকুর জন্য, নির্দিষ্ট সময়টুকুর জন্যই কর্তা সাজা, বাস্তবে নিজেকে তা মনে না করা। কর্মযোগী সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক—যেমন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, দাদা-বউদি ইত্যাদিদের সঙ্গে ওই ওই সম্পর্ক ততক্ষণই রাখেন বা তখনই কর্তা হন, যখন তার সামনে তাঁদের সেবা বা তাদের সম্বন্ধে তাঁর কর্তব্যকর্ম উপস্থিত হয়। তিনি স্ত্রীকে তখনই স্ত্রী হিসেবে মানবেন যখনই স্ত্রী হিসেবে তার সেবার (ভরণপোষণের) প্রয়োজন হবে, অন্য সময় নয়। অন্য সময় সে কারোর কন্যা, কারোর মা, বউদি, ননদ হতেই পারে। এইভাবে সংসারে সবার সেবা করার জন্যই সম্পর্ক রাখবে, আর সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করবে—

'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।'

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করা যায়। অন্যরা তাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করছে কিনা দেখা কর্মযোগীর কর্তব্য নয়। নিজের মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান হলেই অন্যের কর্তব্যের দিকে লক্ষ যায় এবং অন্যের কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই মানুষ নিজ কর্তব্যচ্যুত হয়। তাই কর্মযোগী অন্যের কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেন না। এমনকি নিজ বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়, ঘটনা, পরিস্থিতি এসবের ঊর্ধ্বে উঠে কর্মযোগী কর্ম করেন এবং এই সব মনে রাখেন না। তাই কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়।

লোকসংগ্রহ—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান শ্রেষ্ঠপুরুষদের সতর্ক আচরণ ও তা কীভাবে অনুপ্রাণিত করে তা বলেছেন।

মানুষ মনে করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তির মতোই বোধহয় পরমাত্মাপ্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা সম্ভব। যেমন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা

করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, সেইরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে বোধহয় আরও বেশি পরিশ্রম (তপস্যাদি) করতে হবে। সাধকদের এটি একটি ভুল ধারণা। কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তু (জগৎ-সংসার) পাওয়া যায়, অবিনাশী বস্তু (পরমাত্মা) নয়, কারণ সমস্ত কর্মই সংঘটিত হয় বিনাশশীল বস্তু অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি মনের সাহায্যে আর এইসব বিনাশশীল বস্তুর সহায়তায় অবিনাশীকে পাওয়া যায় না। পরমাত্মা প্রাপ্তি তখনই সম্ভব হয় যখন বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি সর্বতোভাবে শূন্য হয়ে যায়। পরমাত্মাপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে তবেই সংসারে আসক্তিশূন্য হওয়া যায় এবং তাকে পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রাপ্তির বাসনা, আকাঙ্ক্ষার পথে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহেচ্ছাই কিন্তু সর্ব বড় বাধা, আর কোনো বাধা নেই। কর্মযোগ অতি প্রাচীন যোগ এবং জনকাদি অনেক রাজর্ষিরাই এই যোগে অর্থাৎ অনাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন।

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে উদ্দেশ্য ও ফলেচ্ছা দুটি পৃথক। উদ্দেশ্য হল নিত্য-পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা আর ফলেচ্ছা হল অনিত্য বিনাশশীল জাগতিক বস্তু প্রাপ্ত করা। উদ্দেশ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত কৃতকর্ম কখনোই সকাম (ফলেচ্ছাজনিত) হতে পারে না। আর নিষ্কাম পুরুষের (কর্মযোগীর) সকল কর্মই উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য হয়, ফলেচ্ছার জন্য নয়।

কর্মযোগী—**'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যান্ কর্তুমর্হসি'** অর্থাৎ নিষ্কামভাবে (যজ্ঞার্থ) লোকের সেবায় রত থাকেন। আর এই ভাবে কর্ম করলে **'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্'**—তাঁরা পরমসিদ্ধি লাভ করেন।

কোনো কর্তব্যই ছোট বা বড় হয় না আবার শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য কর্তব্যপালন করলেও তা লোকসংগ্রহ হয় না। কেউ দেখুক বা না দেখুক ; কাজ ছোটই হোক বা বড়, পরের সেবায় কর্তব্যপালন করলে তবেই তা স্বাভাবিক লোকসংগ্রহ হয়। অরণ্যে ফুল ফুটলে সেটি শুষ্ক হয়ে পরে ঝরে যায়, কেউ তা লক্ষ করে না। কিন্তু সে তার সুগন্ধ দ্বারা চারদিক মোহিত করে দুর্গন্ধ নাশ করে। এই যে ক্ষুদ্র বনফুল সেও নিরবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী

সেবা করে থাকে। কর্মকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে ঝাড়ু দেওয়া ছোট কাজ আর শাস্ত্র পাঠ বড় কাজ। কর্মফলকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে অল্পদানে কম পুণ্য ও বেশিদানে বেশি পুণ্য মনে হয়। কর্মের প্রাধান্য (আসক্তি) ও কর্মফলের প্রাধান্য (ফলেচ্ছা) ত্যাগপূর্বক কর্ম করলে সকল কর্মই সমান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী (পরমাত্মা প্রাপ্তকারী) হয়ে থাকে।

পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ অন্যান্যরাও অনুসরণ করে থাকেন—**'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'**। এখানে তিনিই শ্রেষ্ঠব্যক্তি যিনি জগৎসংসারকে (শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মীয়, সম্পত্তি আদিকে) এবং স্বয়ংকে (নিজ স্বরূপকে) জানেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 'ব্যষ্টি অহংকার' তো থাকেই না, তাঁদের 'সমষ্টি অহংকার'ও কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারণেই হয়ে থাকে। তাঁদের আচরণের প্রভাব অন্য ব্যক্তিদের ওপর অত্যন্ত বেশি হয়। রেলগাড়ির চালকের মতন, সমাজের প্রধান ব্যক্তিদেরও বিশেষ দায়িত্ব থাকে। রেলগাড়িতে যারা ওঠে তারা শুয়ে বা বসে ভ্রমণ করতে পারে কিন্তু চালককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। সেইরকম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও চালকের মতন নিজ আচরণের ওপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে ভগবৎ সম্বন্ধীয় (পারমার্থিক) ভাবের বহু প্রচারকারী থাকা সত্ত্বেও তাদের উপদেশের প্রভাব খুব কম দেখা যায়। এর কারণ হল বক্তা যা বলেন প্রায়শই নিজে সেইরূপ আচরণ করেন না। তিনি যদি নিজে সেইরূপ আচরণ করেন, সেইমতো উপদেশ দেন, তবে সেইসব কথা বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে, বিনা আচরণে উপদেশ দিলে তা কেবল বারুদভরা বন্দুকের মতোই শব্দ করে চুপ হয়ে যায়। তবে পারমার্থিক উপদেশ এইভাবে পুরোপুরি নষ্ট হয় না, শ্রোতার যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এইসব ভগবৎকথার প্রভাব অল্পবিস্তর তার ওপর অবশ্যই পড়বে।

এই প্রকরণের শেষে ভগবান তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ কীভাবে লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন তা বলেছেন। **'সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত। কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥'** (গীতা ৩।২৫)

এখানে 'সক্তাঃ', 'অবিদ্বাংসঃ' বলা হয়েছে সেই সব সংসারাসক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাদের শাস্ত্রবিহিত কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁরা তত্ত্বজ্ঞও নন দুরাচারীও নন কিন্তু কামনা, বাসনা ও জাগতিক আসক্তির কারণে শুধু নিজের জন্যই কর্ম করে থাকেন। এই সব ব্যক্তিরা কখনো প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদিতে ব্যাপৃত না হয়ে সাবধানতা ও তৎপরতাপূর্বক যথাযথ বিধি সহকারে কর্ম করে থাকেন যদিও তা সকাম কর্ম।

ভগবান এই রীতিকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করে বলেছেন—**'কুর্যাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্'**। এখানে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদেরই অসক্তঃ, বিদ্বান বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে থেকে কামনা, বাসনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সর্বতোভাবে দূর হয়েছে আর তাই এই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের (আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের) সমস্ত আচরণ স্বাভাবিকভাবেই নিষ্কাম হয়, যজ্ঞার্থেই হয়। কিন্তু ভগবান এখানে বলছেন সকাম ব্যক্তি যেরকম ফলপ্রাপ্তির আশায় সাবধানতা ও তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্তব্যকর্ম করে, ভোগী মানুষের ভোগে, মোহগ্রস্ত মানুষের স্বজনে, লোভী মানুষের অর্থে যেমন আসক্তি হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও লোকসংগ্রহে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই হিতে সেইরূপ অনুরাগপূর্বক কর্ম করবেন। তবে এই লোকসংগ্রহ কখনোই লোকদেখানো নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞর মধ্যে কখনো অভিমান থাকে না যে 'আমি লোকসংগ্রহ করছি'। তাঁরা কর্তব্যকর্ম করেন লোকসংগ্রহের জন্যই, নিজের জন্য নয়। সাধারণ লোককে উন্মার্গ (বিপথ) থেকে সরিয়ে সন্মার্গে (সৎপথে) নিয়ে আসাই হল 'লোকসংগ্রহ'। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদিও লোকসংগ্রহে কাজ করেন কিন্তু কখনো সাধারণের মধ্যে অযথা বুদ্ধিভেদ করান না—**'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গীনাম্'**।

বুদ্ধিভেদের কিছু উদাহরণ—

১) অন্যদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করানো। যেমন—তাদের উপদেশ দেওয়া যে কর্ম অতি নিকৃষ্ট, এতে জীব আবদ্ধ হয়, জ্ঞান অর্জন করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২) জগতে সকলেই স্বার্থের জন্য কাজ করে, স্বার্থ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না, আর ফলের আশা ছাড়া মানুষ কাজ করবেই বা কেন। সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্মও করা উচিত নয়।

৩) আবার সাধারণ লোককে বলা যে ফলের আশা করে কাজ করলে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয় তাই কর্ম করা উচিত নয় ইত্যাদি উপদেশ।

এইভাবে বিভ্রান্তিমূলক উপদেশ দিলে আসক্তি ত্যাগ তো হয়ই না উল্টে শুভকর্মও পরিত্যক্ত হতে পারে। সকাম কার্য থেকে ক্রমে নিষ্কামতার দিকে যাওয়া বুদ্ধিভেদ নয় বরং এটাই বাস্তবিক পথ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞব্যক্তির কর্মের ভেদ—(শ্লোক ২৭-৩৫)

ভগবান প্রথমে মোহান্ধ ব্যক্তিদের কথা বলে তারপরে এর থেকে উত্তরণের উপায় বলেছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

(গীতা ৩।২৭-৩৫)

'সকল কর্ম সর্বতোভাবেই প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু অহংকারে মোহান্ধ ব্যক্তি মনে করে 'আমিই কর্তা'।

মহাপুরুষগণ গুণ ও কর্মবিভাগ তত্ত্বত জানেন, তাই তাঁরা গুণগুলি গুণেই আবর্তিত হয় এইরূপ মেনে আর সেগুলিতে আসক্ত হন না।

কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিরা প্রকৃতিজনিত গুণে মোহান্ধ, তাই তাদের গুণে ও কর্মে আসক্তি থাকে। মহাপুরুষদের এদেরও কর্ম থেকে বিচলিত করা উচিত নয়।

সমস্ত কর্তব্যকর্ম বিবেকপূর্বক আমাতে অর্পণ করো এবং কামনা, মমতা ও সন্তাপ পরিত্যাগ করে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করো।

যে মানুষ দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই মত সর্বদা অনুসরণ করে, তিনি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

আর যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবশত এই মত পালন না করে, সে সর্বজ্ঞান বিমূঢ় এবং বিবেকহীন, তাই তার পতন হয়।

সমস্ত প্রাণীই স্ব-প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেন তাই নিগ্রহ করার জন্য জেদ কেন ?

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয় রাগ ও দ্বেষ বিষয়ে আগ্রহ থাকে। মানুষের এইগুলিতে বশীভূত হওয়া উচিত নয় কারণ এ দুটি পরমাত্মপথ লাভের পথে বিঘ্ন বা শত্রু।

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারী, কিন্তু পরধর্ম ভয়প্রদানকারী ও বিপজ্জনক।' (গীতা ৩।২৭-৩৫)

ভগবান এখানে জ্ঞানী ও মূঢ় ব্যক্তির পার্থক্য ও সাধকের প্রতি কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন।

মূঢ়ব্যক্তি—অন্তরের একটি বৃত্তির নাম হল 'অহংকার'। স্বয়ং (স্বরূপ) হল সেই বৃত্তির জ্ঞাতা। কিন্তু ভ্রমবশত যে স্বয়ংকে এই বৃত্তির সঙ্গে একাত্ম করে নেয় সেই ব্যক্তিকে বিমূঢ়াত্মা বলে। আর যদিও সকল কর্ম প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয় কিন্তু বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ নিজেকে কোনো কোনো কর্মের কর্তা হিসাবে মেনে নেয় আর তার এই অহংকর্তৃত্ব বোধকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। যেমন সমুদ্র ছাড়া ঢেউ-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, তেমনি জগৎসংসার ছাড়া শরীরেরও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি যখন শরীরকে 'আমি' (নিজ স্বরূপ) বলে মেনে নেয় তখন তার মধ্যে নানান কর্মের কর্তাভাব প্রকাশ পেতে থাকে এবং নানা কামনাও উৎপন্ন হয়। যেমন—আমার স্ত্রী, পুত্র, অর্থ আদি লাভ হোক, লোকে আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, সবই আমার মতানুযায়ী চলুক ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার এদিকে দৃষ্টিই যায় না যে শরীরকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করে সে প্রথমই নিজেকে আবদ্ধ করেছে আবার এখন কামনাবাসনার দ্বারা বন্ধন দৃঢ়তর করে, নিজেকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানীব্যক্তি—আগের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে **'অহংকার বিমূঢ়াত্মা'** (৩।২৭) (অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত) ব্যক্তিদের সম্বন্ধে। আর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে **'তত্ত্ববিৎ'** (৩।২৮) অর্থাৎ যাঁরা অহংকারের মোহগ্রস্ত হন না তাদের সম্বন্ধে।

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি প্রকৃতিজাত গুণ এবং শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ এ সবই গুণময় এবং একে 'গুণবিভাগ' বলা হয় আর 'শরীরাদির' দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াকে বলা হয় 'কর্মবিভাগ'। অজ্ঞব্যক্তি যখন এই গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ-এর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়।

রেলগাড়ির ইঞ্জিনের চলবার শক্তি আছে কিন্তু চালক সঞ্চালন না করা পর্যন্ত তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। চালক কিন্তু কখনই ইঞ্জিনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না। সেইরকমই শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি—এই চারটি গুণময় এবং কর্মক্ষম, কিন্তু এক সর্বব্যাপী প্রকাশ চেতন যা এই গুণগুলির

থেকে নির্লিপ্ত ও সম্পর্কশূন্য, তাঁর থেকে সত্তা এবং স্ফূর্তি পেলে তবেই এরা কার্য করতে প্রস্তুত হয়। মহাপুরুষগণ এই গুণগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন না, এর থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, কেননা তাঁরা বোঝেন এই সব গুণ প্রকৃতিজাত এবং গুণগুলি গুণগুলিতেই আবর্তিত হচ্ছে। সাধকেরাও এরূপ অনুভব করলে, তাঁরাও তত্ত্ববিৎ হন। পুরুষের (চেতনার) পরিবর্তনের স্বভাব নেই, কিন্তু প্রকৃতিতে পরিবর্তনের (ক্রিয়শীলতার) স্বভাব স্বতঃই বিদ্যমান। তাই পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ মেনে নেয় তখন তার মধ্যেও ক্রিয়াশীলতার অনুভব প্রকাশ পায়—**'কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। পুরুষের যে পরিবর্তন নেই তা পুরুষের অসামর্থ্যের জন্য নয় বরং এটি তাঁর মাহাত্ম্য। তিনি সর্বদা একরস (আনন্দময়), একরূপ থাকেন। বরফের যেমন গরম হওয়ার স্বভাব নেই, পুরুষেরও সেইরূপ পরিবর্তন হওয়ার স্বভাব নেই। যতক্ষণ পুরুষ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে থাকে ততক্ষণ সাধককে 'তত্ত্ববিৎ' বলা যায় না। কারণ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউই তত্ত্ববিৎ হয় না, জগৎকে জানতে সক্ষম হয় না, জগৎ থেকে আলাদা হলেই তবে জগৎকে জানা যায়। আবার পরমাত্মা থেকে পৃথক হলেও পরমাত্মাকে জানা যায় না, পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হলে তবেই পরমাত্মাকে জানা যায়।

জ্ঞানীব্যক্তিদের প্রতি ভগবানের উপদেশ— সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিনটি গুণই মানুষের বন্ধনের কারণ। সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণ, কর্মের আসক্তি দ্বারা রজগুণ এবং প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা তমোগুণ মানুষকে আবদ্ধ রাখে। লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের কামনাবশত মানুষ পদার্থ ও কর্মে আসক্ত হয়। তারা এর উর্ধ্বে ওঠার কথা ভাবতেই পারে না। ভগবান তাই আগের শ্লোকগুলিতে এদের **'অবিদ্বাংসঃ'**, **'কর্মসঙ্গিনাম্'**, **'অজ্ঞানাম্'** ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন।

ভগবান এখানে অজ্ঞব্যক্তিদের **'অকৃৎস্নবিৎ'**ও (পূর্ণভাবে না জানা ব্যক্তি) বলেছেন কারণ তারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার বিধি ঠিকমতো জানলেও গুণ ও কর্মের তত্ত্বগুলিকে ঠিকমতো জানে না এবং সাংসারিক

ভোগ এবং সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্মযোগীই হোন বা জ্ঞানযোগীই হোন—তাঁরা সকল কর্ম করলেও তাঁদের কর্ম বা পদার্থের সঙ্গে স্বতঃই কোনো সম্বন্ধ থাকে না। ভগবান এখানে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ দিয়ে বলছেন যে যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তিরা গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন এবং কামনাবাসনারহিত তাই তাঁরা যেন কখনো সকামভাবে শুভকর্মে নিযুক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের শুভকর্ম থেকে বিচলিত না করেন। অর্থাৎ মহাপুরুষগণের আচরণ, বাণী বা ক্রিয়ায় যেন এমন কোনো ব্যাপার প্রকটিত না হয় যাতে ওই সকাম ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অরুচি জন্মায় এবং তারা এই সমস্ত শুভকর্ম পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের মন শুধু সকামভাব থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত, শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম থেকে নয়। তাহলে জন্ম-মৃত্যুরূপী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন 'আমাকে এই ভয়ানক কর্মে কেন নিয়োগ করছেন ?' এর উত্তরে ভগবান বলেছেন—'আমার উদ্দেশ্য ভয়ানক কর্মে নিয়োগের জন্য নয়, আমার উদ্দেশ্য কর্ম হতে সম্বন্ধ ছেদ করানো।'

সাধকদের প্রতি ভগবানের উপদেশ—ভগবান পরের শ্লোকে কর্মের প্রসঙ্গে বলছেন, যে কর্ম দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই কর্ম দ্বারাই মানুষ মুক্ত হয়। ভগবান ত্রিংশ শ্লোকে বলছেন—**'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য'** অর্থাৎ ভক্তিযোগ দ্বারা, **'অধ্যাত্মচেতসা'** অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং **'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতজ্বরঃ'** অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। 'অধ্যাত্মচেতসা' পদটি দ্বারা ভগবান বলছেন যে সাধক যে পথেই সাধনা করুন না কেন, তাঁর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হওয়া উচিত, লৌকিক নয়। আর আধ্যাত্মচিত্ত অর্থাৎ বিচারবিবেচনাযুক্ত হৃদয় দ্বারা সমস্ত কর্তব্যকর্ম ভগবানে অর্পণ করলে অর্থাৎ এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখলে কর্মগুলি বন্ধনকারক না হয়ে মুক্তিদায়ক হয়।

জগৎ-সংসারকে নিজের বলে দেখলে পতন হয় আর এদের নিজের বলে মনে না করলে অর্থাৎ এদের প্রতি মমত্বহীন হলে উত্থান হয়।

ভগবানে প্রকৃত অর্পণ তখনই সম্ভব যখন করণ (শরীর ইত্যাদি), উপকরণ (জাগতিক বস্তু), কর্ম ও স্বয়ং—এ সবই ভগবানের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। কিন্তু সাধকগণ প্রায়শ এই ভুল করেন যে উপকরণগুলি সবই ভগবানের এই ভাব রাখলেও করণ (শরীরাদি) ও স্বয়ংও যে ভগবানের সেই ভাব রাখেন না। এর ফলে তাঁদের অর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। অর্পণ সম্পূর্ণ হলে সাধকের তখন আর না জগতের থেকে বা না ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তাঁর প্রয়োজন ভগবানই ব্যবস্থা করে দেন। ত্যাগের, অর্পণের মহিমা অসীম। কোনো বস্তুকে নিজের মনে করে ভগবানে অর্পণ করলে ভগবান কয়েকগুণ করে সেটি তাকে ফিরিয়ে দেন, যেমন বীজ বপন করলে সেটি কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়ে ফিরে আসে। বস্তু নিজের বলে মনে না করে যদি ভগবানকে অর্পণ করা হয় তবে ভগবান তার কাছে ঋণী হয়ে যান, সে ভগবানকে লাভ করে। এর মানে এই নয় যে অর্পণ করলে ভগবানের কোনো সাহায্য হয়, আসলে মানুষের প্রকৃত অর্পণের ভাবে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যেমন একটি ছোট ছেলে মাটিতে পড়ে যাওয়া চাবি তার বাবাকে উঠিয়ে দিলে বাবা খুশি হন, যদিও ছেলেটি বাবার, অঙ্গনটিও বাবার এবং চাবিটিও বাবার। আসলে বাবা খুশি হন চাবিটি পাওয়ার জন্য নয়, বরং ছেলের প্রত্যার্পণের ভাব দেখে।

পদার্থগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া, ইহাদের প্রাপ্তিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করাই প্রত্যার্পণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ভগবান বলছেন **'নিরাশী-র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতজ্বরঃ'** অর্থাৎ নতুন কোনো বস্তুর জন্য কামনা করো না, প্রাপ্ত বস্তুতে মমত্ব রেখো না আর বিনাশশীল বস্তুর নাশে সন্তাপ (শোক) করো না, ইহাই হল প্রকৃত অর্পণের ভাব।

কামনার পূর্তি ও নিবৃত্তি—এই দুটির জন্যই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। সাধারণ মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় কামনা পূরণের জন্য, আর সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হন কামনা নিবৃত্তির জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য—**'সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে'** (গীতা ৫।১১)।

ভগবানের মত মানা ও না মানার ফল—পরের দুটি শ্লোকে (৩১-৩২)

ভগবান তার মত (প্রকৃতির নিয়ম—ঋত) মানার ও না মানার ফল বলেছেন। যাঁরা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করেন তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান আর যারা এরূপ করে না তাদের পতন হয়। এর তাৎপর্য হল যে, মানুষ ভগবানকে মানুক বা না মানুক তাতে ভগবানের কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু তাঁর মত (সিদ্ধান্ত) অবশ্যই পালনীয় আর এটাই হল ভগবানের নির্দেশ। মানুষ যদি তা না করে তবে তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

সাধক যদি ভগবানের মত মেনে চলেন এবং তাঁকে মান্য করেন তবে তিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করেন, কিন্তু যদি তিনি কেবল ভগবানের মত মেনে চলেন তবে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। **'প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়'**—এই হল ভগবানের মত। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ, সম্পদ, পদার্থ এমনকি জগৎ-সংসার সবই প্রকৃতির কার্য। এইগুলি কারোর ব্যক্তিগত নয়, কেবল এগুলির ব্যবহারের অধিকারই ব্যক্তিগত। আবার সদগুণ, সদাচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদিও ব্যক্তিগত নয় বরং এ সবই ভগবানের। এই সব নিজের বলে মনে করলে অভিমান বা অহং কর্তৃত্বভাব জন্মায় যা আসুরী-সম্পদের মূল কারণ। জাগতিক বস্তু যতই সংগৃহীত হোক না কেন তার দ্বারা কখনো পরিতৃপ্তি আসে না। তৃপ্তি বা পূর্ণতা কেবল নিজের প্রকৃত বস্তু (অর্থাৎ ভগবান) প্রাপ্ত হলেই হয় আর তখন অন্য কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। যেমন জগতের সমস্ত পুত্রবতী নারীই জননী, কিন্তু বালকদের যে কোনো মাকে পেলে আনন্দ হয় না, সে কেবল নিজের মাকেই খোঁজে, তাকে পেলেই সন্তুষ্ট। সেইরকম যতক্ষণ কামনাবাসনা থাকবে বুঝতে হবে প্রকৃতবস্তু পাওয়া হয়নি, যা পেলে সমস্ত কামনাবাসনার নিবৃত্তি হত।

যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না এবং সমস্ত কর্মই আসক্তি ও দ্বেষপূর্বক করে তাদের ভগবান বলেছেন **'বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ'** অর্থাৎ তাদের পতন অনিবার্য, মানে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ থাকে।

স্বভাবের পার্থক্য ও প্রকৃতির বশ্যতা—ভগবান বলছেন **'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি'** অর্থাৎ যত কর্ম করা হয় সবই স্বভাব ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়।

স্বভাব দুই প্রকারের হয় রাগদ্বেষযুক্ত ও রাগদ্বেষরহিত। কোনো বন্ধুর পত্র পেলে সেটি অনুরাগের সঙ্গে লোকে পড়ে আর শত্রুর পত্র পেলে লোকে দ্বেষযুক্ত হয়ে পড়ে। আবার পথচলার সময় পথে কেউ কোনো বিজ্ঞাপন দেখলে রাগদ্বেষরহিত হয়ে পড়ে। এই সবই হয় তার স্বভাব অনুযায়ী। আবার গীতা, রামায়ণ আদি পাঠ সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়। সিদ্ধান্ত তাকেই বলে যেটি শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী হয়। শাস্ত্র ও ভগবানের নির্দেশ না থাকলে তাকে সিদ্ধান্ত বলে না। মনুষ্যজন্ম হয় পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য, তাই পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সকল কর্মও সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়।

ভগবান যখন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি নিজ প্রকৃতিকে (স্বভাবকে) বশীভূত করে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেই যোনীর স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করেন। যেমন ভগবান যখন শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপে বা মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই সেই প্রকাশ অনুযায়ীই কর্ম করেন। এর তাৎপর্য এই যে ভগবানের অবতার দেহেও বর্ণ এবং যোনি অনুযায়ী স্বভাবের পার্থক্য থাকে কিন্তু বশ্যতা থাকে না। তাঁর সকল কর্মই রাগ-দ্বেষরহিত হয়। যে মহাপুরুষদের প্রকৃতি (জড়ত্ব) থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাদেরও স্বভাবে পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। এঁদের সকল কর্ম রাগ-দ্বেষরহিত এবং শাস্ত্রানুযায়ী হয়[১]।

কিন্তু যে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, যার স্বভাব অশুদ্ধ (রাগ-দ্বেষযুক্ত) তাদের স্বভাবে পার্থক্য ও বশ্যতা দুই থাকে। অর্থাৎ তারা নিজ সৃষ্ট স্বভাবের বশে বাধ্য হয় অর্থাৎ রাগ-দ্বেষযুক্ত হয়ে কর্ম করে। প্রকৃতপক্ষে রাগ এবং দ্বেষ ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত থাকে না। মানুষের স্বভাবগত রাগ-দ্বেষ অনুযায়ী নিজ অনুকূল-প্রতিকূল ভাব প্রতিভাত হয় তাতেই সমস্ত

---

[১]জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ শাস্ত্রমর্যাদাকে শ্রদ্ধা করেন। তাই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় পিতার হাত প্রত্যক্ষভাবে দেখলেও ভীষ্ম শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কুশের উপরেই পিণ্ডদান করেন (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৮৪।১৫।২০)।

যেমন কোনো গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীমা একশো মাইল হলে সেটি কখনোই এই গতি অতিক্রম করে না, সেইরকম মহাপুরুষ দ্বারাও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কাজ বা শুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টাই থাকে না।

কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

নবধা ভক্তি

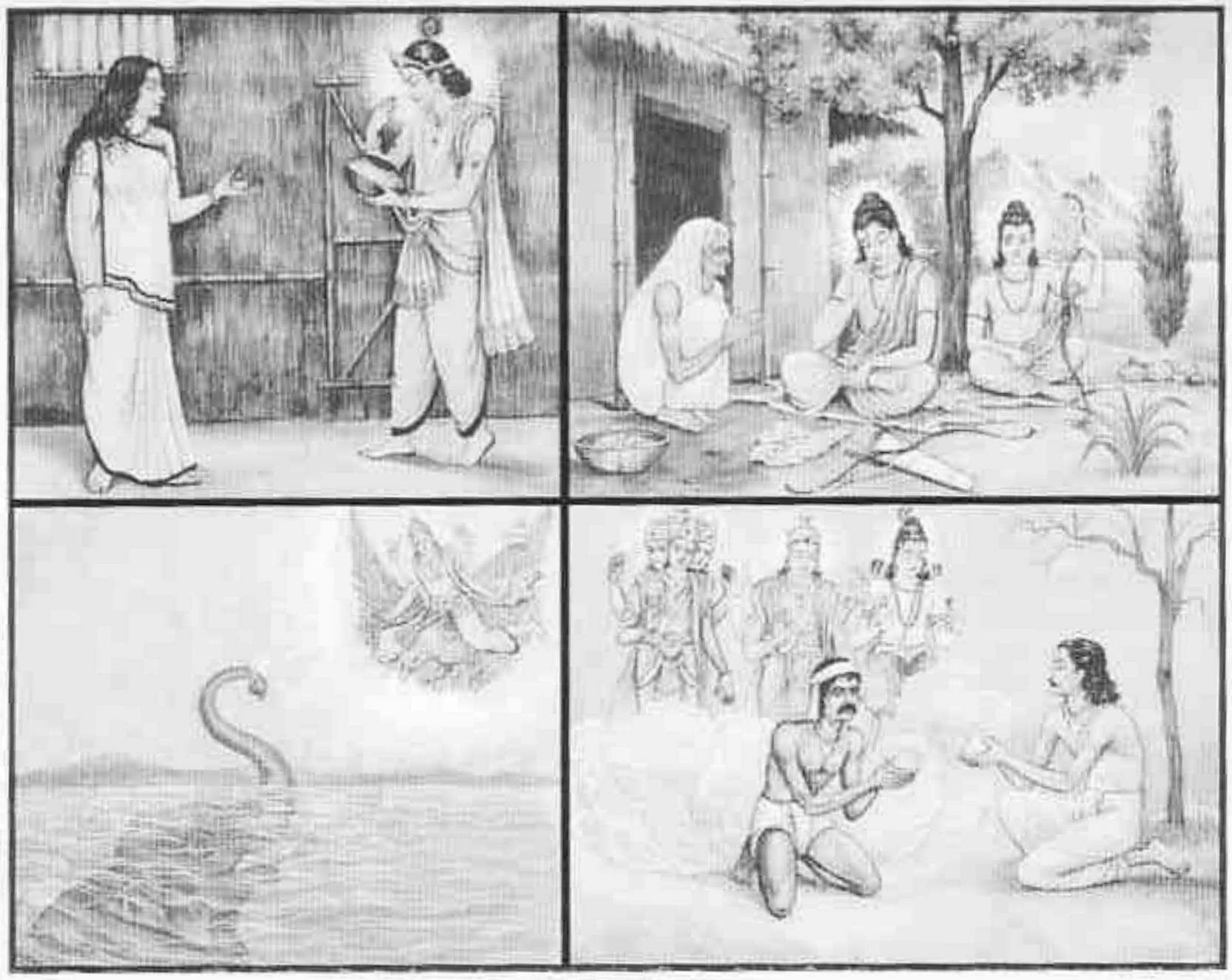

'পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ং'—ভক্ত দ্রৌপদী, গজেন্দ্র, শবরী ও রন্তিদেব

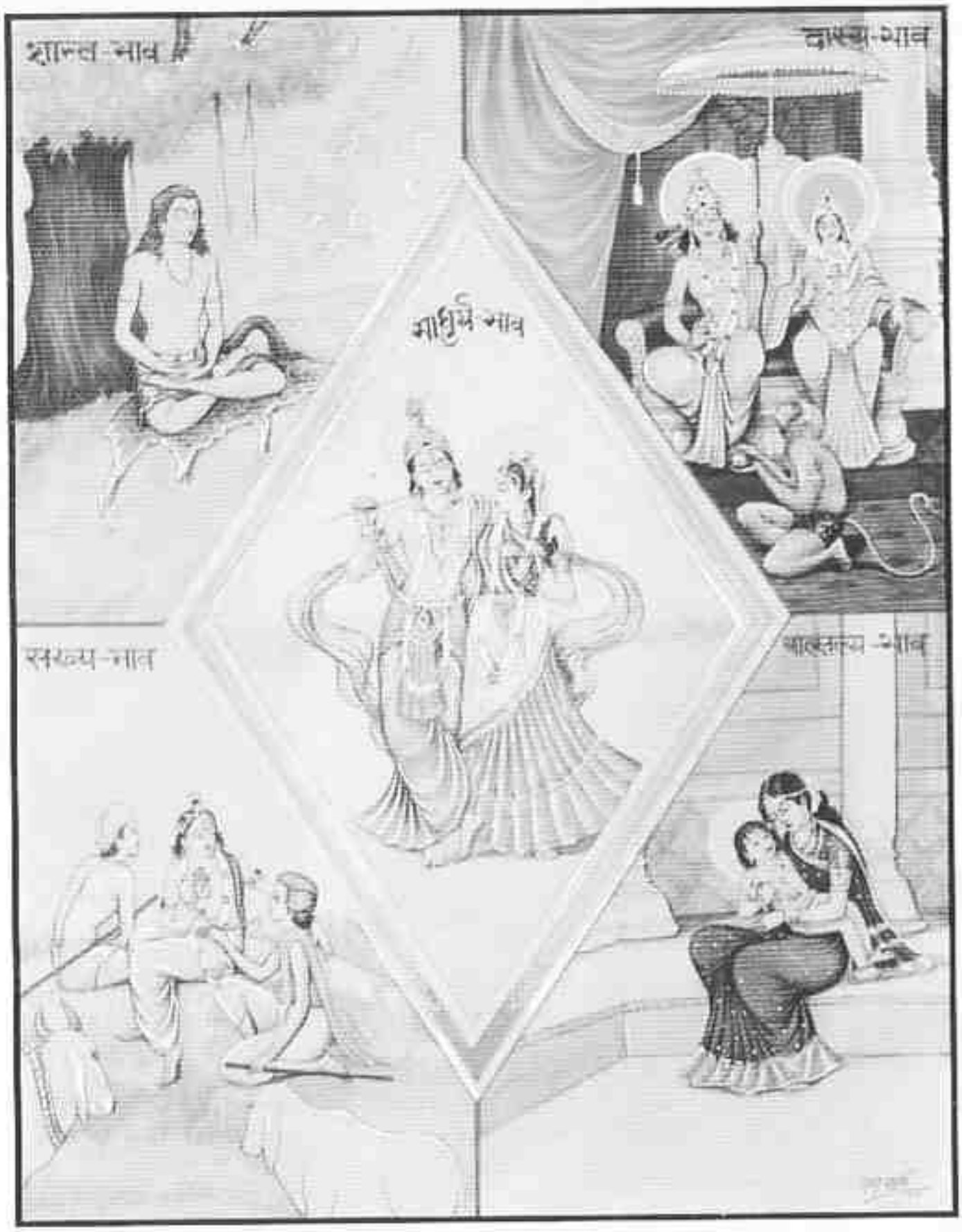

ভক্তির পঞ্চরস—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য

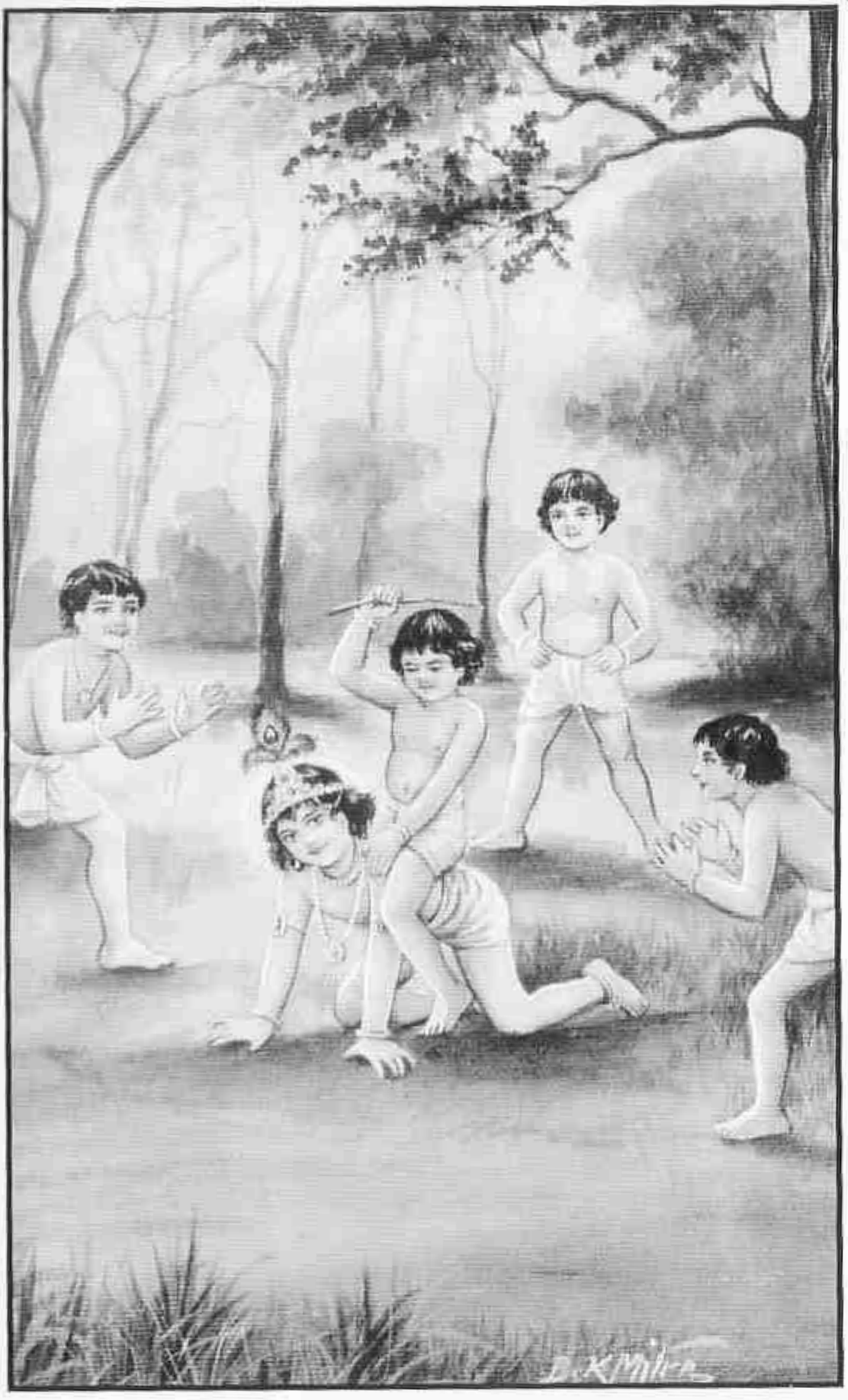

শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া উপভোগ (ন্যায়প্রিয়তা)

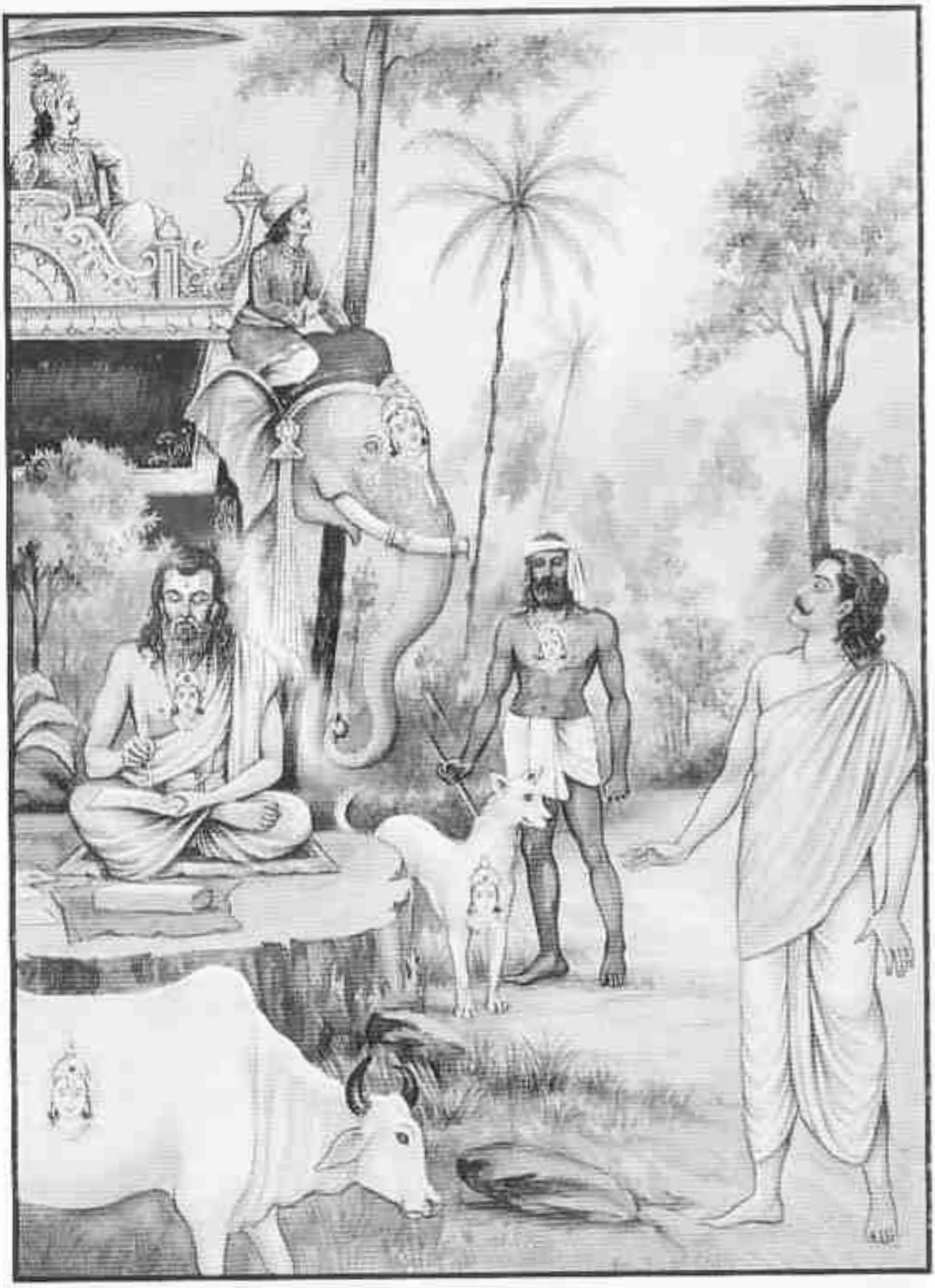

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি .... পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীতা ৫।১৮)—সমদর্শিতা

মহারাস

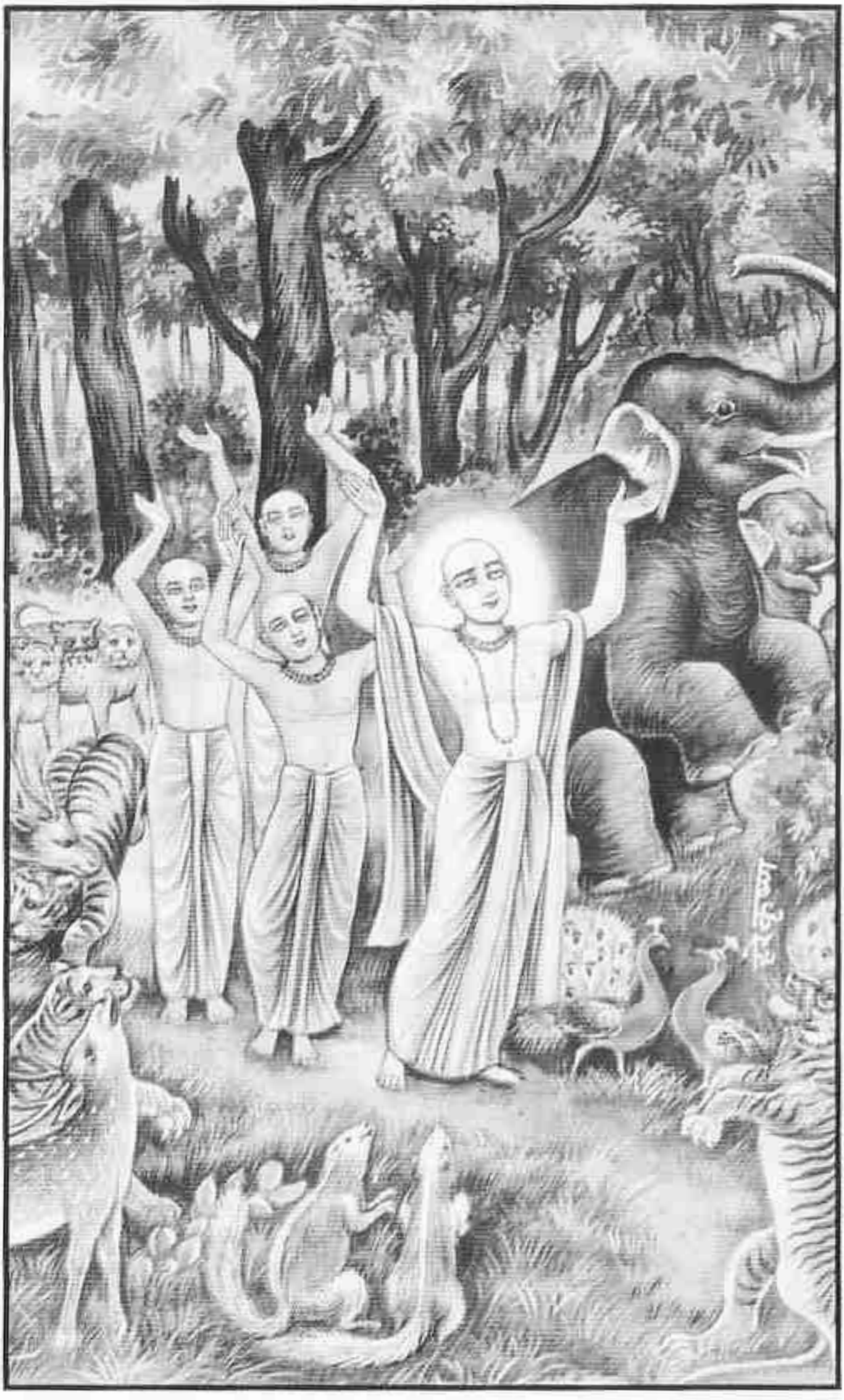

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কীর্তনের অলৌকিক প্রভাব

বস্তু প্রিয়-অপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাগ এবং দ্বেষ প্রকৃতপক্ষে মেনে নেওয়া 'অহম্'-এ থাকে। আর নিজেকে শরীর বলে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 'অহম্' বলা হয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে রাগ-দ্বেষ অন্তঃকরণের ধর্ম এগুলি দূর করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই রাগ-দ্বেষ কিন্তু অন্তঃকরণের ধর্ম নয় এগুলি আগন্তুক, বিকার—**'এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্'** (গীতা ১৩।৬)। ভগবান একে মনোগত বলেছেন—**'কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্'** (গীতা ২।৫৫)। অর্থাৎ কামনার মনে আগমন হয়, সর্বদা থাকে না। সাধক সাধন-ভজন করতে থাকলে অনুভব করেন যে রাগ-দ্বেষ উত্তরোত্তর স্তিমিত হচ্ছে আর সাধনে প্রেম জাগ্রত হলে সাধক রাগ-দ্বেষ হতে মুক্ত হয়। সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যান ইত্যাদিতে যদি রাগ বা অনুরাগ হয় তবে সংসারের প্রতি দ্বেষভাব আসে। আর যদি ভগবৎপ্রেম আসে তবে সংসারের প্রতি উপেক্ষা বা বৈরাগ্য আসে। সংসারের যে কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি হলে বিপরীত জিনিসের প্রতি দ্বেষ দেখা দেয়, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম হলে সংসারের প্রতি দ্বেষ না হয়ে বৈরাগ্য ভাব আসে। আর বৈরাগ্য এলে সংসার থেকে সুখ পাওয়ার চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং জগতের সেবা স্বাভাবিকভাবে হয়। রাগ-দ্বেষ দূর করার অব্যর্থ উপায় হল নিষ্কামভাবে জগৎ সংসারের সেবা করা। স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর, কারণ-শরীর থেকে শুরু করে তথাকথিত অহং পর্যন্ত যা কিছু নিজের বলে মনে হয় সবই জগৎ সংসারের সেবায় লাগানো উচিত। যেন ভাব আসে **'ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'**—প্রভু তোমার বস্তু তোমাকে নিবেদন করলাম।

অবশ্য সেবা প্রকৃতপক্ষে ভাব থেকে হয়, বস্তু থেকে নয়। বস্তুসামগ্রী প্রদান করলেই সেবা হয় না। দোকানদারও বস্তুসামগ্রী দিয়ে সেই সঙ্গে কিছু পাওয়ার আশা করে বলে তাতে পুণ্য হয় না। প্রজা রাজাকে কর দান করলেও সেবা হয় না, কাউকে দান করে পুণ্য হয়েছে বলে মনে করলে অথবা সে সুখী হয়েছে এই চিন্তা করলেও তা প্রকৃত সেবা নয়। বস্তুগুলোর প্রভাব সেবায় পড়লে সেবা হয় না। এর দ্বারা দান বা পুণ্যের কথা ভাবাও উচিত নয়,

বরং কিছু দিলে তা ভুলে যাওয়া উচিত। জগতে কিছু প্রাণী আছে দুঃখী, কিছু প্রাণী সুখী। দুঃখীদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও সুখীদের সুখে সুখী হওয়াও সেবা। কারণ এতে দুঃখী ও সুখী—উভয় ব্যক্তিরই সুখ অনুভূত হয় এবং তারা ভরসা পায় যে তাদের কেউ সাথী আছে। সেবা করার অর্থ হল—সকলকে সুখী করা। **'মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ'** অর্থাৎ কারও যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ না হয়—এই ভাব হলেই তিনি সকলকে সুখী করেন, সকলেরই প্রকৃত সেবা করেন।

অপরকে সুখ-দুঃখের কারণ মেনে নিলেই সুখ-দুঃখ হয়, রাগ-দ্বেষ জন্মায় অর্থাৎ যে সুখপ্রদান করে বলে মনে করা হয় তার প্রতি অনুরাগ এবং যে দুঃখ দেয় বলে মনে করা হয় তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। অন্তরে রাগ-দ্বেষ থাকার জন্যই জগৎ-সংসার ভগবৎস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় না, জড় ও বিনাশশীল বলে প্রতীত হয়। রাগ-দ্বেষ না থাকলে সব কিছুই চিন্ময় পরমাত্মা **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)।

শাস্ত্রের সার কথা হল—

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ১৯।৩৫৫-৫৬)

'হে মানব ! তোমরা ধর্মের সার শোনো এবং শুনে ধারণ করো যে, আমরা যা নিজের জন্য চাই না, তা অপরের প্রতি যেন না করি।'

স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—এই প্রকরণের শেষ শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ'** অর্থাৎ নিজ ধর্ম স্বল্পগুণ হলেও শ্রেষ্ঠ। বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য নিঃস্বার্থভাবে পালন করাই হল স্বধর্ম। আস্তিক ব্যক্তি যাকে 'ধর্ম' বলে, সেটি প্রকৃতপক্ষে হল কর্তব্য। স্বধর্ম পালন ও নিজ কর্তব্য পালন একই ব্যাপার। মানুষের পক্ষে স্বধর্ম পালন করা সহজ ও স্বাভাবিক। মানুষের জন্ম হয় তার পূর্ব কর্ম অনুযায়ী এবং তার জন্ম ও স্বভাব অনুসারেই ভগবান তার কর্ম স্থির করেন—**'কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ'** (গীতা ১৮।৪১)। নিজ নিজ কর্মপালন করলে মানুষ

কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ তার কল্যাণ হয়।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে **'পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'** অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের থেকে স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। এখানে উল্লেখ্য যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী সকল মানুষেরই নিজ নিজ কর্তব্য (বা স্বধর্ম) কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। নিজ কর্তব্যকর্ম অন্যদের কর্তব্যকর্ম থেকে কম গুণসম্পন্ন হলেও এই নিয়মের তারতম্য হয় না। যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য (যুদ্ধাদি) ব্রাহ্মণের কর্তব্যের (শম, দম, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি) থেকে অহিংসাদি গুণগুলি কম দেখায়। এখানে **'বিগুণঃ'** পদটির অর্থ এই যে অন্যের কর্তব্য থেকে নিজের কর্তব্যের গুণগুলি কম বলে মনে হলেও সেটি কল্যাণকারী হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বাহ্যত কর্তব্যকর্মগুলি পৃথক অর্থাৎ কোনোটি ক্রূর বা কোনোটি সৌম্য বলে প্রতিভাত হলেও পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা একই ফল দিয়ে থাকে।

স্বধর্ম পালন সুখ-আরাম, ধন-সম্পত্তি, মান-যশ, সমাদর-সম্মান বা সুখ-দুঃখর দিকে দৃষ্টি রেখে করা যায় না, তা কেবল ভগবান বা শাস্ত্রের নির্দেশ মেনেই নিষ্কামভাবে পালন করতে হয়। তাই স্বধর্ম পালনকালে কেউ কোনো কষ্ট অনুভব করলেও তা উন্নতিকারক হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে একে কষ্ট না বলে তপস্যাই বলা যায় এবং স্বধর্ম পালনে তপস্যার চেয়েও শীঘ্র উন্নতি লাভ হয়। তপস্যা হয় নিজের জন্য ও কর্তব্য পালন হয় অন্যের জন্য। ভগবান আরও বলেছেন **'পরধর্মো ভয়াবহ'** অর্থাৎ পরধর্ম পালন আপাত সহজ বলে মনে হলেও এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যদি স্বার্থপরতা ত্যাগ করে পরহিতের জন্য স্বধর্মপালন করে তা সর্বদাই মঙ্গলকারক।

এখানে সাধারণ ধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম বিচারসাপেক্ষ। মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়াদির দমন এগুলি সকলেরই স্বধর্ম এবং সকলেরই তা পালন করা উচিত। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা 'স্বাভাবিক কর্মও' বটে কারণ এটি পালনে সাধারণত তার কোনো পরিশ্রম হয় না, কিন্তু অন্যদের ইহা পালনে সামান্য হলেও পরিশ্রম হতে পারে। সকলের পক্ষে এই সব সাধারণ ধর্ম ভিন্ন, নিজ

নিজ সাধারণ ধর্ম (স্বধর্ম) পাপময় মনে হলেও তাতে প্রকৃতপক্ষে পাপ হয় না। শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য মনে করে (স্বার্থ, দ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগ-পূর্বক) শৌর্যবীর্য সহকারে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়ায় এটি পাপকার্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে পাপ হয় না—**'স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ১৮।৪৭)। স্বভাবজাত কর্তব্যকর্ম করলে কোনো পাপ হয় না। যে সাধকগণ পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের কর্তব্যকর্ম করার সময় অর্থ-যশ-মান-মর্যাদা-শ্রদ্ধা-আরাম ইত্যাদি পাওয়ার ইচ্ছে জাগে না। এই সব না পেলেও তাঁরা চিন্তিত হন না আবার প্রারব্ধবশত এগুলি পেয়ে গেলেও তাতে তাঁরা আনন্দিত হন না। সংসারে পরাজয়, ক্ষতি, কষ্ট, অপমান ইত্যাদিতেও তাঁদের স্বাভাবিক প্রসন্নতা থাকে। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁদের কাছে সাধনসামগ্রী হয়ে ওঠে।

সাধন অবস্থা থেকেই কর্মযোগীদের প্রাণীদের হিত করার স্বভাব থাকায় তাঁরা **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ৫।২৫, ১২।৪) হয়ে ওঠেন। জ্ঞানী অবস্থাতেও তাঁদের কিছু করা, জানা বা পাওয়া বাকি না থাকলেও তাঁদের মধ্যে অন্যদের মঙ্গল করার স্বভাব থেকে যায়। অন্যের হিতের জন্য কাজ করতে করতে জগৎসংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও তাঁরা স্বভাববশেই স্বতঃই অন্যের হিতসাধনা করে যান, তখন আর তাদের চেষ্টা করতে হয় না।

নিষ্কামভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করাকে (কর্মযোগ) স্বধর্ম বলে। স্বধর্মকেই গীতায় 'সহজ কর্ম', 'স্বকর্ম' এবং 'স্বভাবজ কর্ম' বলা হয়েছে।

তাগ (কর্মযোগ), বোধ (জ্ঞানযোগ) এবং প্রেম (ভক্তিযোগ)—এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় এগুলি সকলের স্বধর্ম। স্বধর্মে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ অভ্যাস শরীরের সঙ্গে যুক্ত এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই পরধর্ম।

———○———

তৃতীয় প্রশ্ন

অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সংশয়মিশ্রিত। ভগবানের কথা অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হবেন, না বুদ্ধিকে (জ্ঞানযোগকে) আশ্রয় করবেন। ভগবান তখন অর্জুনকে বুঝালেন বুদ্ধিকে আশ্রয় করা মানে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে কর্মত্যাগ নয়। বুদ্ধিকে আশ্রয় করা হল বুদ্ধিকে সমত্ব ভাবে রেখে কর্ম করা। আর কর্মবিধি সম্বন্ধে কৃষ্ণ বলছেন যে, কর্ম করবে **'যজ্ঞার্থ'** অর্থাৎ ত্যাগভাব সামনে রেখে। ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর শেষ করেছিলেন এই বলে যে স্বধর্মই কল্যাণকারক এবং পরধর্ম ভয়াবহ।

অর্জুনের মনে তখন প্রশ্ন জাগলো যে— এই সব কথা জেনেও মানুষ কেন স্বধর্মে প্রবৃত্ত না হয়ে পরধর্মে প্রবৃত্ত হয়।

অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন— (শ্লোক ৩৬)

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

(গীতা ৩।৩৬)

'হে বার্ষ্ণেয় ! মানুষ এসব জেনেও এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হয়ে পাপাচরণ করে।'

ভগবান পরবর্তী ৭টি শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

পাপের প্রবৃত্তির কারণ ৩৭-৪০

পাপ হতে নিবৃত্তির উপায় ৪১-৪৩

পাপে প্রবৃত্তির কারণ—(শ্লোক ৩৭-৪০)

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥

(গীতা ৩।৩৭-৪০)

'ভগবান বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ক্রোধই হল পাপের কারণ। ইহা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপী। ইহাকেই তুমি নিত্য শত্রু বলে জানবে।

যেমন ধূম্র দ্বারা বহ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ, জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামনার দ্বারাই জ্ঞান বা বিবেক আবৃত থাকে।

এই কামনা, বিবেকবান পুরুষের চিরশত্রু। অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এই কামনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি (জ্ঞান) আচ্ছন্ন করে রাখে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই কামনার আশ্রয়স্থল। এইগুলিকে আশ্রয় করে কামনা দেহাভিমানী মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করে মোহগ্রস্ত করে।' (গীতা ৩।৩৭-৪০)

ভগবান সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয় আর চতুর্দশ অধ্যায়ে বলেছেন **'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্'** (গীতা ১৪।৭)—তৃষ্ণা (কামনা) এবং আসক্তি থেকেই রজোগুণ উৎপন্ন হয়। এর তাৎপর্য হল জাগতিক বিষয়গুলিকে সুখদায়ক মনে করলে (যা রজোগুণ) কামনা উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় এই কামনার প্রভাবে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। এই রজোগুণ ও কামনা পরস্পরের বৃদ্ধি ততক্ষণ চলতেই থাকে যতক্ষণ পাপকর্ম হতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তি না হয়। কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলে কাম ক্রোধে পরিণত হয়। আবার বাধাপ্রদানকারী যদি শক্তিশালী হয় তবে তা ভয়ে পরিণত হয় এবং কামনার পূরণ হলে তার থেকে ভবিষ্যতের ভোগেচ্ছারূপী 'লোভ' উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ভগবান বলেছেন **'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'** (গীতা ৪।১০) বা **'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ'** (গীতা ৫।২৮)—কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ভয় এবং ক্রোধ ত্যাগ করবে। কামনা

বাস্তবে স্থায়ী হয় না। সেটি নিরন্তর মিটে যেতে থাকলেও মানুষ নতুন নতুন কামনার বশীভূত হয়। মানুষ যদি নতুন নতুন কামনার বশীভূত না হয় তাহলে পুরাতন কামনাগুলি হয় পূরণ হয়ে যাবে নয়তো পূরণ না হওয়ায় তা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যাবে। কামনাকেই চার ভাগে ভাগ করে তা নির্বাপিত করতে হয়—

১) শরীর নির্বাহের জন্য আবশ্যক প্রত্যেকটি কামনা পূরণ করা উচিত কিন্তু কখনোই পূরণের সুখভোগ থাকা উচিত নয়। এই কামনার চারটি প্রকার থাকে—

ক) যে কামনার বর্তমানে উৎপত্তি হয়েছে।

খ) যেটি পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখনই পাওয়া সম্ভব।

গ) যেটি পূরণ না হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ঘ) যার পূর্তির দ্বারা নিজের বা অন্যের কারো ক্ষতি না হয়—যেমন ক্ষুধার সময় খাদ্য গ্রহণ করা।

২) যে কামনা ব্যক্তিগত ও ন্যায়সঙ্গত কিন্তু সামর্থ্যের বাইরে, সেগুলি ভগবানে সমর্পণ করে মিটিয়ে ফেলতে হয়।

—যেমন জগতে যাতে অন্যায় অত্যাচার না হয়, মনে এই কামনা হলে তা ভগবানকে সমর্পণ করতে হয় যাতে তা ভবিষ্যতে পূর্ণ হয় (ভগবান ইচ্ছা করলে)।

৩) যে কামনা ন্যায়সঙ্গত ও অপরের পক্ষে হিতকারী এবং যেটি পূর্ণ করা সম্ভব, সেটি পূর্ণ করা উচিত।—এতে অর্থাৎ অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে নিজের কামনা ত্যাগের ক্ষমতা এসে যায়।

৪) উপরোক্ত তিন কামনা বাদে অন্যসব কামনা বিবেচনা দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে হয়।

কিন্তু যদি সুখ পূরণের জন্য কোনো কামনা থাকে তবে তা জীবকে নিশ্চিতরূপে নিজ কর্তব্য থেকে এবং অবশ্যই নিজ স্বরূপ থেকে বিচ্যুত করে বিনাশশীল জগতের আবর্তে এনে ফেলে।

দুর্যোধন বলছেন—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(গর্গসংহিতা, মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫০।৩৬)

'আমি ধর্মকে জানি, তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, আমি অধর্মকেও জানি, কিন্তু তা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। আমার হৃদয়ে অবস্থিত কোনো এক দেবতা, আমাকে দিয়ে যা করান আমি সেইরূপই করে থাকি।'

দুর্যোধন কথিত এই 'দেব' প্রকৃতপক্ষে 'কাম' (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা), যার ফলে মানুষ বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করে ধর্মকে পালন বা অধর্মকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।[১]

কামনা ত্যাগের প্রধান উপায় হল 'কর্মযোগ' অর্থাৎ স্থূলশরীর ও পদার্থাদি দ্বারা অপরের সেবা করা, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা পরহিত চিন্তা করা এবং কারণশরীর দ্বারা সুসংস্কার বা স্থৈর্য (স্থিরতা) করা, কিন্তু এদের থেকে যেন কোনোভাবেই সুখগ্রহণ না করা হয়। কামনাময় চিত্তে কর্মযোগ সম্ভব নয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে, চিত্তের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছে—

'চিত্তনদী নাম, উভয়তো বাহিনী।
বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ॥'

অর্থাৎ চিত্তরূপ নদী উভয়দিকে প্রবাহিত হয়—কখনো কল্যাণের পথে কখনো পাপের পথেও। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আরও বলেছেন —**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (১।২) অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে পারলে তবেই যোগস্থ হওয়া যায়। কিন্তু কামনাময় চিত্তকে নিরোধই বা করা যাবে কীভাবে ? তাই গীতা বলছে নিরোধের আগে কামনায় আবৃত চিত্তকে সাধনা দ্বারা শোধন করতে হবে।

পরবর্তী আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সত্ত্ব-রজ-তমগুণ ভেদে কামনা কীরূপে বিবেককে আবৃত রাখে তা বলেছেন।

---

[১]যে কোনো শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম প্রারব্ধ (ভাগ্য) থেকে হয় না, হয় 'কামনা' থেকে। প্রারব্ধের থেকে ফল ভোগ করার জন্য কর্ম করার প্রবৃত্তি হলেও তাতে নিষিদ্ধ কর্ম করতে হয় না।

সত্ত্ব—যেমন অগ্নি ধূম্র দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু ফুঁ দিলে ধোঁয়া সরে যায় আর অগ্নি প্রকাশ পায়, সেইরকম সাত্ত্বিক ব্যক্তির কামনাবাসনা স্বল্প-আয়াসেই দূরীভূত হয়ে তার বিবেক জাগ্রত হয় এবং প্রবৃত্তি ভগবদ্‌মুখী অর্থাৎ স্বধর্মাভিমুখী হয়।

লালাবাবু ও অন্য মহাপুরুষদের আখ্যান—রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বিশাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুর্শিদাবাদে কান্দির রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও পাইকপাড়া রাজবাটি ও তৎকালীন বঙ্গদেশের (ওয়ারেন হেস্টিংসের সমসাময়িক) বহু ভূখণ্ডের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পত্তির কোনো হিসাব ছিল না। শোনা যায় তার মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি তৎকালীন অঙ্কের ২০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। তাঁর একমাত্র পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময়ও তিনি সহস্র সহস্র নিমন্ত্রণপত্র সোনার পাতের উপর খোদাই করে বিলি করেন। লালাবাবুর প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। নানাভাষায় পণ্ডিত লালাবাবু ছোটবেলা থেকেই কোমল ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সহস্র মুদ্রা দান করে তিনি পিতার বিরাগভাজন হন এবং বর্ধমানে এসে কালেকটারে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। এক সময় পুরীর রাজা জগন্নাথ মন্দিরের কর ঠিক সময় না পাঠানোতে ব্রিটিশ সরকার মন্দিরটি নিলামের আদেশ জারি করেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ লালাবাবু জগন্নাথদেবের এই পবিত্র পীঠস্থানের অবমাননা বোধে তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে এই নিলাম রোধ করে দেন। কৃতজ্ঞতা বোধে পুরীর রাজা এক বিস্তৃত অঞ্চল তাঁকে উপহার দেন। অদ্যাপি নবকলেবরের নিম্ববৃক্ষটি লালাবাবুর জমি হতেই গৃহীত হয়। জগন্নাথদেবের কৃপা লালাবাবুর অন্তরে ভক্তিবীজরূপে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়।

পিতার দেহত্যাগের পর লালাবাবু রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একদিন শিবিকা (ঘোড়াগাড়ি) করে জমিদারি মহল দর্শন করে ফেরার সময় তিনি এক বালিকার গলা শুনতে পেলেন। মেয়েটি কাছের পুকুরে কর্মরত একটি ধোপার মেয়ে। সন্ধেবেলায় শুকনো কলাপাতায় আগুন দিয়ে ময়লা কাপড় সিদ্ধ করার জন্য ভাটি চড়ানো হয়। মেয়েটি মাকে বলছে—

'মা সাঁঝ গেলো বাসনায় আগুন দিবিনি।'

কথাটি লালাবাবুর মনে ধক করে প্রবেশ করল। তাঁর মনের আবরণ সরে গেল। মনে হল সত্যিইতো, আমার জীবনসায়াহ্ন উপস্থিত অথচ আমি কামনা-বাসনার এই চাহিদাতে তো এখনও আগুন লাগিয়ে ভগবৎমুখী হতে পারিনি। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল, একটি বাক্যই স্ফুলিঙ্গরূপে কাজ করল।

'হরি ভজনের লাগি ধাম বৃন্দাবনে
চলিলেন মহারাজ আনন্দিত মনে ॥'

রাজা লালাবাবু শিবিকা থেকে নেমে একবস্ত্রে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

'পথে পথে ব্রজধামে
জয় শ্যাম রাধা নামে
মাধুকরী করি সদা আনন্দে।'

বৃন্দাবনে এক ভক্ত শেঠজি ছিলেন, বৃন্দাবনে তিনি একটি বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণের প্রাক্কালে কিছু জমির অধিগ্রহণ নিয়ে লালাবাবুর সঙ্গে শেঠজীর বিরোধ বাঁধে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরিশেষে লালাবাবুর জয় হয়। শেঠজীর যথেষ্ট মনোকষ্ট হলেও তাঁর কিছু করার ছিল না। প্রভুর বিচিত্র লীলা ! এরপর থেকে লালাবাবু অনুভব করতে লাগলেন যে সাধন-ভজনে তিনি আগের মতন মনোনিবেশ করতে পারছেন না। কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টি তিনি তাঁর গুরু মহারাজকে জানালেন। গুরু মহারাজ অনুভব করলেন যে শিষ্যটির দ্বারা কোনও ভক্তের প্রতি অপরাধ হয়েছে। তিনি লালাবাবুকে সেই ভক্তের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা (মাধুকরী) করতে বললেন। লালাবাবু তাঁর গৃহে ভিক্ষা করতে গেলেন। তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্য—

'কাঁদিল প্রহরী দ্বারী কেঁদে ওঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে, পদধুলি পঙ্কে।
শেঠজি ছুটিয়া আসে বাঁধে তারে বাহুপাশে
নারীরা ফুঁপিয়া কাদে, ফুকারিয়া শঙ্কে॥'

লালাবাবুর মনে যৎকিঞ্চিত যে অভিমান ছিল তা ততক্ষণ দূর হয়ে গেছে, তিনি তখন অন্তর্সমাহিত, বাহ্যজগতে তাঁর দৃষ্টি নেই—

'লালাবাবু কন ভাই এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরাতে চাই, শুধু এক মুষ্টি।
শেঠ কহে জুড়ি পানি আজ পরাজয় মানি
ইহলোকে পরলোকে, জিতে গেলে বৈরী।'

লালাবাবু মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ছেড়ে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে রাধারানীর পদকমলে শ্রীবৃন্দাবনধামে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রূপ ও সনাতন গোস্বামী—সনাতন ও রূপ গোস্বামী তখন সুবে বাংলার নবাব, হুসেন শাহর প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী (দবীর খাস ও সাকর মল্লিক)। এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে নবাব কোনো এক বিশেষ কারণে দুই ভাইকে তলব করেন। পালকি বেহারারা বরকন্দাজ সহ সন্তর্পণে তাঁদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক নগরবাসীর গৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে বাড়ির শিশুপুত্রটি মাকে জিজ্ঞাসা করছে, মা রাস্তায় এ কীসের শব্দ। তখন মা বলছে বাবা এত রাত্রে, এই দুর্যোগে রাস্তার এই শব্দের কারণ হয় চোর, না হয় কুকুর, নয়তো রাজার গোলাম যাচ্ছে। এই কথাকটি রূপ-সনাতনের বুকে শেলের মতো বিদ্ধ হল, মন বৈরাগ্যে ভরে গেল। তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের রামকেলি গ্রামে আগমন উপলক্ষে দুই ভাই তাঁর দর্শনে যান ও আত্মনিবেদন করে ধন্য হন।

গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনে স্ত্রীর শ্লেষাত্মক বাক্য ও বিল্বমঙ্গলেরও বেশ্যার মুখে বিদ্রূপ বাক্য শুনে তাঁদের সংসার-বৈমুখ্য জাগে আর তাঁরা সংসার ত্যাগ করে ভক্তিরাজ্যের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন।

রজ—যখন আয়না (আদর্শ) ধূলিদ্বারা আবৃত থাকে তা খুব সহজে অর্থাৎ ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। পরিষ্কার করতে হলে কাপড় দিয়ে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে হয়। সেইরকম রজোগুণীর চিত্তের মল অর্থাৎ কামনা-বাসনা দূর করতে গেলে পরিশ্রম লাগে অর্থাৎ নিরন্তর সাধনা করে, জীবাত্মা শরীরের প্রতি একাত্ম হওয়ায় যে কামনার আবরণে আবৃত হয়, তা দূর করতে হয়।

ধ্রুব মহারাজ—ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদে ধ্রুব মহারাজের জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখিত আছে। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার দুইটি পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী সুনীতি ও সুরুচি এবং তাদের মধ্যে সুরুচিই তাঁর অধিক প্রিয়। সুনীতির ছেলের নামই ধ্রুব। পঞ্চবর্ষীয় ধ্রুব একবার পিতার কোলে উঠতে গিয়ে বিমাতার কাছে তীব্র ভর্ৎসনা খেয়ে মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মা বললেন—বাছা ! আমি তোমার পিতার অপ্রিয় তাই উনি তোমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করলেন। যাইহোক তুমি যদি পরমপুরুষ হরিকে আরাধনা কর তবে তিনি এর প্রতিকার করবেন। ধ্রুব রজগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, তার মনে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ধ্রুব তখন তপস্যা করতে যাত্রা করলেন। মহর্ষি নারদ ভাবলেন **'অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্'** (ভাগবত ৪।৮।২৬)। অর্থাৎ অহো ! ক্ষত্রিয়ের কী প্রভাব। তারা কিছুতেই অপমান সহ্য করতে পারে না। তিনি তখন তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধ্রুব বললেন—**'তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ'** (ভাগবত ৪।৮।৩৬) অর্থাৎ আপনার উপদেশ অতি উপাদেয় কিন্তু রজ আধিক্য এবং অদম্য ক্ষত্রিয় স্বভাববশত আমি অতি উদ্ধত এবং বিমাতার বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাই আমি প্রতিকারের জন্য উদ্গ্রীব। আমার পূর্বপুরুষগণের বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে যা পাওয়া কখনো সম্ভব হয়নি এইরূপ কিছু আমাকে পেতেই হবে। আপনি তদুপযোগী উত্তম পথ প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারদ দ্বাদশ অক্ষরবিশিষ্ট **'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'**—এই মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাকে হরি পূজার পদ্ধতি উপদেশ দান করেন। তখন ভক্ত ধ্রুবও **'সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্'** (ভাগবত ৪।৮।৭১) একাগ্র মনে ভগবান পুরুষোত্তমের আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। ছয় মাস ব্যাপী তীব্র আরাধনার পর ভগবান শ্রীহরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে ধ্রুবকে দর্শন দান করতে আগমন করলেন। ভগবানকে দর্শন করে ধ্রুব **'দৃগ্ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবশ্লিষন্'** (ভাগবত ৪।৯।৩)। অর্থাৎ ধ্রুব অধীর হয়ে উঠলেন, ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, নয়ন যুগল

দ্বারা তাঁর রূপ পান করতে লাগলেন, প্রণামকালে যেন মুখ দ্বারা চরণ চুম্বন করতে লাগলেন এবং বাহুদ্বারা পুনঃ পুনঃ বেষ্টনে তাঁর পাদপদ্ম আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

ধ্রুবর প্রবল ইচ্ছা হল ভগবানকে স্তুতি করার কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় বালকের কীভাবে স্তুতি করতে হয় তা অজ্ঞাত। ভগবান তখন তাঁর সর্ববেদময় শঙ্খ দ্বারা তার কপোল স্পর্শ করাতেই ধ্রুবর মনে ভগবৎস্তুতি স্ফূরিত হল। ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ের নবম স্কন্ধের ৬-১৭ শ্লোকে ধ্রুবর স্তুতি বর্ণিত আছে।

ভগবান ধ্রুবর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করে বললেন তুমি যে সঙ্কল্প অনুসারে তপস্যা করছ তা দ্বারা যদিও পরমপুরুষার্থ মঙ্গলময় ফলপ্রাপ্তি দুরূহ, তবুও আমি তা তোমার জন্য বিধান করছি। পিতার পরে তুমি ৩৬০০০ বৎসর ধর্মপথে রাজ্যপালন করে অন্তিমে আমার কথা চিন্তা করতে করতে আমারই লোক (ধ্রুবলোক) প্রাপ্ত হবে। ভগবান অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব কিন্তু **'প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্বাণং নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্'** (ভাগবত ৪।৯।২৭) অর্থাৎ খুবই ক্ষুণ্ণ মনে পিতৃগৃহে গমন করলেন।

ঋষি মৈত্রেয় ধ্রুবর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ বলছেন—

'নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং তস্মাত্তাপমুপেয়িবান্' (ভাগবত ৪।৯।২৯) অর্থাৎ তিনি মুক্তিপতি ভগবানের নিকট মুক্তি বা তদীয় অনুচরস্বরূপ পরমার্থ কামনা না করে রজগুণ আধিক্যবশত রাজসুখ প্রার্থনা করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজ ভাবছেন, দেখ আমার কী মন্দভাগ্য **'মন্দভাগ্যস্য পশ্যত'**, আমার প্রার্থনা যেন **'ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি'** অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির চিকিৎসার ন্যায় ব্যর্থ। আমি পার্থিব জিনিস কামনা করে ভগবৎ সাধনায় রত হয়েছিলাম। যাই হোক, ধ্রুব পিতার রাজ্যে ফিরে গেলে মহারাজ তাকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন এবং রাজ্য প্রদান করে বাণপ্রস্থে প্রস্থান করলেন। ভাগবত ধ্রুবর প্রতি এই প্রীতির কারণ বলেছেন—

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্॥ (ভাগবত ৪।৯।৪৭)

'জল যেমন সর্বদাই নিম্নাভিমুখী, সেইরকম ভগবান শ্রীহরি যাঁর সমত্ব, মৈত্রী গুণে প্রসন্ন হন, সকল প্রাণীবর্গ তাঁর নিকট আপনি নত হয়ে থাকে।'

এইভাবে বহুদিন সুশাসনে রাজত্ব করে অন্তিমকালে তাঁর ভগবৎকথাই স্মরণে এল এবং দেখলেন নন্দ ও সুনন্দ নামে ভগবানের অনুচর তাঁকে ধ্রুবলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত। তখন ধ্রুব মহারাজ ভগবৎ কৃপায়–

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥ (ভাগবত ৪।১২।৩০)

'মৃত্যুর মস্তকে নিজ পাদদ্বয় স্থাপনপূর্বক সেই উত্তম বিমানে তিনি ধ্রুবলোক যাত্রা করলেন।'

তম—তমগুণসম্পন্ন লোকেদের আবার কামনাবাসনা দূর করতে গেলে উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করতে হয়, সময় লাগে। আশু সাধনার দ্বারা তমগুণ অপসারণ সম্ভব নয়। যেমন গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম কেবল নির্দিষ্ট সময়েই হয়, অন্য কোনো উপায়ে নয়, সেইরূপ তমগুণীরও বাসনা নিবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই তিনটি গুণ ক্রম অনুযায়ী ১, ১০ ও ১০০-র মতো। এদের গুণগত অবস্থান ১০ গুণ করে হলেও, আসলে তমোগুণ (১) ও রজগুণ (১০) কাছাকাছি আর সত্ত্বগুণ (১০০) এদের থেকে অনেক দূরে।

অনধিকারী শিষ্য—একবার এক তত্ত্বজ্ঞ সাধুর কাছে এক অনধিকারী ব্যক্তি দীক্ষা নিতে এসেছে। গুরু তার সংস্কারে তমগুণের প্রাধান্য দেখে বললেন এখন নয় তোমার দীক্ষা পরে হবে। ব্যক্তিটি বারে বারে সাধুর কাছে আসে আর সাধু মহারাজও ফিরিয়ে দেন। অবশেষে একদিন ব্যক্তিটি সাধুকে বলল আজকে তবে আমার গৃহে ভিক্ষা নিন। সাধু মহারাজ রাজি হলেন। ব্যক্তিটির বাড়ি গিয়ে সাধুমহারাজ ভিক্ষার পাত্রটি বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইলেন। লোকটি বলে, মহারাজ আপনার জন্য অনেক ভালো ভালো পরমান্ন, পুষ্পান্নাদির আয়োজন করেছি আপনার পাত্রটি পরিষ্কার নয় ওটিকে পরিষ্কার করে গ্রহণ করুন। সাধু বললেন না আমি এপাত্রেই ভিক্ষা নেব। লোকটি বলল, মহারাজ আপনার ভিক্ষাপাত্রটি ময়লায় ভর্তি, ওতে ভালো

জিনিস দিলে তার কোনো আস্বাদ পাবেন না। তখন সাধু বললেন—বাছা ! তোমাকে আমি এইজন্য দীক্ষা দিইনি। তোমার মন কামনাবাসনা কুটিলতায় পূর্ণ। এইরকম অপবিত্র চিত্তে ভগবানের নামে দীক্ষা দিলে তা প্রস্ফুটিত হত না। যতদিন পর্যন্ত না তোমার কামনার বেগ প্রশমিত হয় ততদিন তোমার সাধনায় মন বসবে না। অপেক্ষা করো।

যমলার্জুন—নলকুবর ও মণিগ্রীব কৈলাসপতি রুদ্রের কিঙ্কর ও তাঁর ধনভাণ্ডারী কুবেরের পুত্র। তাঁরা নব-বয়স, প্রচুর ধনসম্পদের আধিপত্য, রুদ্র-কিঙ্কর জনিত প্রভুত্ব এবং অবিবেকের মিলনে একেবারে মদান্ধ হয়ে যথেচ্ছ জীবন যাপন করতেন। শান্ত পরম পবিত্র শিব-তপোবন কৈলাসকেও ভেঙেচুরে প্রমোদকাননে পরিণত করার জন্য তাঁরা সচেষ্ট থাকতেন।

একবার নারদ ঋষি কৈলাসে শিব-সদনে হরি লীলাকীর্তন করতে করতে যাওয়ার সময় এই মদমত্ত দুই ভাইকে অপর-অপ্সরাগণের সঙ্গে কৈলাস-গঙ্গায় উন্মত্ত ও নগ্ন অবস্থায় জলবিহারে রত দেখলেন। ধনগর্বে গর্বিত ও মদিরাপানে মত্ত এই দুজন নারদের আগমনের প্রতি ভ্রূকুটি না করে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ও বিকট চিৎকারে অপ্সরাগণকে আহ্বান করতে লাগলেন। নারদ দেখলেন এরা দেবযোনিজাত হয়েও ধনগর্বে গর্বিত এবং এই ধনগর্বই এদের মদিরাপান, বেশ্যাসক্তি, ঋষি অবমাননা প্রভৃতির সুযোগ দিয়েছে এবং অধিকার প্রদান করেছে। পরম ভাগবতোত্তম নারদ ঋষির হৃদয়ে কিন্তু এর ফলে ক্রোধ বা ক্ষোভ সৃষ্টি না হয়ে অন্তরে কৃপার উদয় হল। ভক্তচূড়ামণিদের হৃদয় সদাই পরানুগ্রহকাতর, তাই তিনি ভাবলেন এই বহির্মুখ মদমত্তদের কীভাবে উদ্ধার করা যাবে, কীভাবে এরা হরিভজনের অধিকার পাবে ? নলকুবের ও মণিগ্রীব মূঢ়, তমগুণে আচ্ছন্ন তাই তাদের উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত উন্নতি সম্ভব নয় অথচ ধনান্ধ হয়ে থাকলে কোনোক্রমেই তাদের বিবেক জাগ্রত হবে না। তাই তিনি নলকুবর ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিতে মনস্থ করলেন যাতে তারা স্থাবর হয়ে জন্মগ্রহণ করে, নতুন কোনো পাপাচারে পতন না ডেকে এনে, নতুন মদান্ধতায় জড়িয়ে না পড়ে, পূর্ব পাপ স্খালন করে। কেননা নারদ জানেন—

বিদ্যামদঃ ধনমদস্তথা চাভিজনো মদঃ।
মদা এতৈরলিপ্তানাং ত এব চ সতাং দমাঃ॥ (বৈষ্ণবতোষণী ধৃত প্রাচীন)

"বিদ্যা, মদ ও ধন—ত্রিবিধভাবে মদ সৃষ্টি করে থাকে। আর এতে লিপ্ত না হলে এরাই 'দমরূপে' প্রকাশ পায়।"

দেবর্ষি নারদ এই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুকম্পাবশত তাদের শাপপ্রদান করলেন—

অহোহর্হতঃ হ্যাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎ প্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥ (ভাগবত ১০।১০।২১-২২)

নারদ অভিশাপ প্রদানের সময় চিন্তা করলেন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করলে এদের আর ধনমদমত্তা হবে না। আমার অনুগ্রহে এরা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সর্বদাই স্মরণে রাখবে। দেবপরিমাণ শতবর্ষে তাদের মূঢ়তা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করে পুনরায় দেবদেহ ধারণ করবে এবং শ্রীগোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ করবে। নারদের অভিশাপে দুজনেই বৃন্দাবনে যমলার্জুনরূপে (যমজ বৃক্ষ) জন্মগ্রহণ করলেন। শ্রীভগবান তাঁর ভক্তর বাক্য রক্ষা করতে সর্বদাই সচেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের দামোদর লীলায়, মা যশোদা কর্তৃক তাঁকে উদুখলের সঙ্গে বন্ধনের সময় তাঁর ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের কথা মনে পড়ল। ঋষিগণ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ও মন্ত্রপ্রচারক। ভগবান দেখলেন যে ঋষিবাক্যের কদাপি অন্যথা হওয়া উচিত নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম পবিত্র দামোদর লীলায় স্থির করলেন নলকুবর ও মণিগ্রীবের উদ্ধারের সময় আগত। তিনি তাঁর কোমরের সঙ্গে বাঁধা উদুখলটিকে নিয়েই হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। তখন উদুখলটি দিব্য পরিমাণ শতবর্ষ প্রাচীন অর্জুন গাছ দুটিতে আটকে তাদের উৎপাটিত করে দিল। বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হলে তার মধ্যে থেকে দুইজন অলৌকিক এবং জ্যোতির্ময় পুরুষ নির্গত হলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণস্তুতি করতে লাগলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিং স্তমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মাণা বিদুঃ॥ (ভাগবত ১০।১০।২৯)

'হে কৃষ্ণ ! তুমি সর্বজগতের আদি, প্রকৃতির, ব্রহ্মাণ্ডের এবং সর্বজীবের অন্তর্যামী পুরুষ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কার্যকারণাত্মক জগৎকে তোমারই অধিষ্ঠানরূপে ধ্যান করেন।'

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল। বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥
অনুজানীহি নৌ ভূমং স্তবানুচরকিঙ্করৌ। দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্ণঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সত্যাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

(ভাগবত ১০।১০।৩৬-৩৮)

'হে কৃষ্ণ ! আপনার চরণে প্রণাম। আপনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। আপনি গোপগণের পালনকর্তা। আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে পরমেশ্বর ! আমরা ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের দাসানুদাস। সেই পরমদয়ালু দেবর্ষি নারদের কৃপাতে আমরা মহাপরাধী হয়েও আপনার শ্রীচরণদর্শনে সমর্থ হয়েছি।

হে ভগবন্ ! আমাদের বাক্-ইন্দ্রিয় যেন সর্বদাই আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকথা বর্ণনায় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যেন উহা শ্রবণে নিযুক্ত থাকে। আমাদের কর্মেন্দ্রিয় যেন সতত আপনার সেবাকর্মে এবং মন যেন আপনার স্বরূপে মত্ত থাকে। আমাদের মস্তক যেন আপনার নিবাসস্বরূপ জগতের নিকট সর্বদা নত থাকে। আমাদের নয়নও যেন সর্বদা আপনার শ্রীবিগ্রহ এবং আপনার ভক্তচূড়ামণিগণের দর্শনে রত থাকে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যে বললেন—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরা মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্নোঃ সবিতুর্যথা॥
তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামঙ্গিতঃ পরমোঽভবঃ॥

(ভাগবত ১০।১০।৪১-৪২)

'হে নলকুবর ও মণিগ্রীব ! যেমন সূর্যোদয় হলে নয়নের আঁধার দূর হয়, সেইরূপ মানাপমানে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তগণের দর্শনেই মদান্ধ জীবমাত্রেরই অজ্ঞান আঁধার কেটে যায়। তোমাদের তমভাব দূর

হয়েছে এবং ভক্ত নারদের কৃপায় তোমাদের আমাতে রতি লাভ হয়েছে, তোমরা আমার কথা চিন্তা করতে করতে স্বস্থানে চলে যাও। তোমাদের আর পতনের ভয় নেই।'

এইভাবে মহৎকৃপা এলেও সময়কালেই তমগুণীদের বিবেক জাগ্রত হয়।

পরের উনচল্লিশ ও চল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলছেন, এই কামনা দুষ্পূরণীয় এবং বিবেকবান সাধকদের নিত্যশত্রু (জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা)। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে বলে 'কামনা'। হৃদয়ে যে সূক্ষ্ম কামনা অবদমিত থাকে তাকে বলে 'বাসনা'। জাগতিক বস্তুর প্রয়োজনীয়তাকে বলে 'স্পৃহা'। বস্তুগুলির প্রিয়ভাব নজরে আসাকে বলে 'আসক্তি'। বস্তুগুলির লাভ করার সম্ভাবনাকে বলে 'আশা' এবং অধিক পরিমাণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বলে 'লোভ' বা 'তৃষ্ণা'। এসকলই হল 'কাম'-এর বিভিন্ন রূপ এবং পারমার্থিক পথের বিরাট বাধাস্বরূপ। কামনার অনুকূল বস্তু সর্বদা ভোগ করতে থাকলে কামনা তৃপ্ত হয় না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্রমে পাপকর্মে নিয়োজিত করে। আর এই কামনারূপী পাপকর্মের আশ্রয়স্থল হল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি।

পাপ হতে নিবৃত্তির উপায়—(শ্লোক ৪১-৪৩)

ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোকে পাপ আচরণ হতে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় বলেছেন।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

(গীতা ৩।৪১-৪৩)

'ভগবান বলছেন—হে অর্জুন সর্বপ্রথমে তুমি, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত

করে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশী ঘোর পাপস্বরূপ এই কামকে (কামনা) সবলে বিনাশ করো।

ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বলবান ও অধিক প্রকাশক)। মন আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন থেকে শ্রেষ্ঠ হল বুদ্ধি এবং কামনা হল বুদ্ধির চেয়েও প্রবল।

এইভাবে কামনাকে বুদ্ধির চেয়েও বলবান জেনে নিজের আত্মশক্তি দ্বারাই একে বশীভূত করবে। এবং হে অর্জুন ! কামনারূপ দুর্জয় শত্রুকে অবশ্যই নাশ করবে।' (গীতা ৩।৪১-৪৩)

আগে বন্ধনের মূল তথা কামনার কথা বিস্তৃতভাবে বলার পর ভগবান উপরোক্ত তিনটি শ্লোকে কামনার স্থিতি ও কামনা ত্যাগের প্রকৃষ্ট উপায় বলেছেন। ভগবান কামনাকে 'অনলেন' (অগ্নির ন্যায়) ও দুষ্পূরেণ (যা পূরণ করা সম্ভব নয়) বলে বলেছেন। ভোগ্যপদার্থের নিত্য আহরণ দ্বারা কখনো কামনা পূরণ হয় না। যেমন যেমন ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্ত হতে থাকে তেমন তেমন কামনাও বাড়তে থাকে। সাধনের পথে প্রধান বাধা হল সুখের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা। ভোগের সুখ হল সংযোগজনিত আর সমাধি আদির সুখ হল বিয়োগজনিত। সংযোগজনিত সুখ গ্রহণ করে রজোগুণ-তমগুণসম্পন্ন লোকেরা তাদের পতন ঘটায়। তাই ভগবান বলেছেন **'ন তেষু রম্যতে বুধঃ'** (গীতা ৫।২২)। আর বিয়োগজনিত সুখ হয় সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের এবং এই সাত্ত্বিক সুখের আসক্তিও পরমাত্মা প্রাপ্তির পথে বাধা প্রদান করে। এই বাধা **'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি'** (গীতা ১৪।৬)।

কামনা সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন এর অনুভূতি বা কর্মস্থান, শরীর (বা বিষয়), ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিতে হলেও অবস্থিতি কিন্তু আরও গভীরে অর্থাৎ 'অহং'-এ। আর এই অহং থেকে কামনা ত্যাগের কথা সর্বশাস্ত্রেই বলেছে।

শরীর বা বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ কারণ ইন্দ্রিয়গুলিতেই বিষয়সমূহের প্রকাশ ঘটে বা এদের দ্বারাই বিষয়জ্ঞান হয়। আবার ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হলেও অন্য ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞাতব্য

বিষয় সম্বন্ধে জানে না। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ও তাদের অনুভূত বিষয় মনের গোচর। মনই ইন্দ্রিয়দের প্রকাশক। বুদ্ধি আবার মনের প্রকাশক। মন শান্ত না চঞ্চল, মন সুখী না দুঃখী তা বুদ্ধিই নির্ণয় করে। আবার ইন্দ্রিয়গুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এবং তাদের উপলব্ধ বিষয়গুলিও বুদ্ধি জানে। তাই বুদ্ধি হল মন, ইন্দ্রিয়াদি ও শরীর অপেক্ষাও শ্রেয়। কিন্তু বুদ্ধিরও কর্তা আছে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং। স্বয়ং (নিজ স্বরূপ) হচ্ছে চেতন, নির্বিকার কিন্তু ইহা যখন জড়ের (প্রকৃতিজাত শরীরের) সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় তখন স্বরূপ শরীরের কর্তা হয়ে যায় এবং উৎপন্ন হয় 'অহম্'। এই অহম্-এর জড় অংশে প্রাধান্য থাকে সংসারের এবং চেতন অংশে প্রাধান্য থাকে পারমার্থিক প্রাপ্তির ইচ্ছার।

ভগবান অবশ্য এখানে সমষ্টি 'অহং'-এর কথা বলেননি, সেটা বলেছেন সপ্তম অধ্যায়ের প্রকৃতির বিভাগ সম্পর্কে বলার সময়—

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা ।।' (গীতা ৭।৪)

এই সমষ্টি বা ব্যষ্টি অহং পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অংশ।

আর বর্তমানে উল্লিখিত এই ব্যষ্টি অহং-এ বাস করে কামনা বা ইচ্ছা। অহং-এরও পরে বিরাজ করেন পরমাত্মার অংশ সাক্ষাৎ 'স্বয়ং'—যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও অহং—এই সবেরও আশ্রয়, আধার প্রেরক, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই বলবান ও প্রকাশক। কিন্তু জড়ের সংস্পর্শে এসে কামনা বা ইচ্ছার দুটি ভাগ হয়ে যায়—অহংএর জড়মুখী অংশে থাকে লৌকিক কামনা (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা) এবং চেতন অংশে থাকে ভগবদ্‌মুখী পারমার্থিক কামনা। মানুষের চিত্তে দুই প্রকার ইচ্ছা থাকায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং যখন লৌকিক কামনা জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন পারমার্থিক প্রাপ্তির ইচ্ছা অবদমিত হয়। আবার যখন পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা সুদৃঢ় হয় তখন দ্বন্দ্ব দূর হয়, ফলে সাধক সহজেই পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়—**'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (গীতা ৫।৩)। সাধনপথের বাধা লৌকিক কামনা দূর করার কথা সর্ব শাস্ত্রেই বলেছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে উপদেশ দিয়েছেন—

কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্।
কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৫১।৭)

'এই জগতে একমাত্র কামবন্ধনই বন্ধন, অন্য কোনো বন্ধন নেই। সুতরাং মানুষ সেই কামবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে।'

মহর্ষি বেদব্যাস বলছেন—

নাকামো ম্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ বৈ দ্বিজঃ॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৪৮।৩)

'কামনাশূন্য লোকের মৃত্যু হয় না আর নিষ্কাম ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।'

কঠোপনিষদের যমরাজ-নচিকেতা সংবাদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কামনা নাশ-এর কথা বলা হয়েছে।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
(ক.উ. ২।৩।১৪, বৃ.উ. ৪।৪।৭)

'মানবের হৃদয়ে স্থিত কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তখন মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করে এবং এটিই হল মনুষ্য দেহেই ব্রহ্মকে সম্যক্ অনুভব করা।'

ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রের বর্ণনা আছে। এই স্কন্ধের নবম অধ্যায় হিরণ্যকশিপু বধের পর ভক্ত প্রহ্লাদ ৭ম হতে ৫০তম অর্থাৎ ৪৩টি শ্লোকে বিষ্ণুস্তুতি করেছেন। ভগবান বিষ্ণু প্রহ্লাদের স্তব শুনে নৃসিংহ অবতার রূপে তাঁর হিরণ্যকশিপু বধের ক্রোধ সংবরণ করে অভিলাষিত বর দিতে চাইলে প্রহ্লাদ বলছেন—হে প্রভু, কামনাসঙ্গে আমি ভীত। মুমুক্ষু বলেই আপনার চরণাশ্রয় করেছি, আমাকে আর অন্য বর দিয়ে প্রলুব্ধ করবেন না—

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥ (ভাগবত ৭।১০।৯)

'মানব যখন সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হন।'

বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্মতর 'অহম্'-এর জড়াভিমুখী অংশে স্থিত এই কামনাকে নাশ করার উপায় হল অহমের চেতনাভিমুখী অংশ দ্বারা একে সংযত করা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান একেই **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** ও **'যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ'** দ্বারা উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং-এর অনন্ত বল। তাঁর সত্তা অবলম্বন করেই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সত্তাবান ও বলবান হয়ে থাকে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে স্বয়ংই নিজ শক্তির কথা বিস্মৃত হয়। তাই স্বরূপকে সংসার অভিমুখী না করে পরমাত্মা অভিমুখী করতে হবে। পরমাত্মার সাহায্য নিয়ে তার বল বাড়াতে হবে। জড়ের প্রতি কামনাকে নাশ করার উপায় হল—

১) জাগতিক বস্তুগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়া, কেননা এই গুরুত্বই কামনা পরিত্যাগ শক্ত করে দেয়।

২) নতুন কোনো কামনা না করা।

৩) কর্মযোগে রত হওয়া। কর্মযোগের দ্বারা অতি সহজেই এই কামনা নাশ করা। কর্মযোগী সাধক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ যে কোনো জাগতিক ক্রিয়াই অন্যের হিতার্থে করে যাবেন, নিজ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, কিছু চান না বা নিজের বলে কিছু মানেনও না, ফলে তাঁর কামনা সর্বতোভাবে নাশ হয় আর ঈশ্বরলাভের পরম উদ্দেশ্য সফল হয়।

———o———

চতুর্থ প্রশ্ন

ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বিস্তৃতভাবে বলার পর চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বললেন এই যোগ অতি প্রাচীন এবং এই উপদেশ প্রথমে তিনি সূর্যকে বলেন ও বংশপরম্পরাগতভাবে সেটি মনু ও ইক্ষ্বাকু দ্বারা প্রচলিত হয়। কালের ব্যবধানে এই কর্মযোগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁর সেই উপদেশ পুনরায় তিনি অর্জুনকে জানাচ্ছেন।

অতঃপর অর্জুনের সরল প্রশ্ন—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

(গীতা ৪।৪)

'আপনার জন্ম তো হয়েছে এখন (শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সমসাময়িক ও সমবয়স্ক) আর সূর্যের জন্ম হয়েছে অনেক আগে অর্থাৎ কল্পের আদিতে। সুতরাং আমি কী করে বুঝব আপনি সূর্যকে কল্পের আদিতে এই যোগের কথা বলেছেন।'

ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮টি শ্লোকে (৫-৪২ শ্লোক) দিয়েছেন।

১. ভগবানের জন্মের দিব্যতা	শ্লোক ৫-৮
২. ভগবানের কর্মের দিব্যতা	শ্লোক ৯-১১, ১৩-১৫
৩. জীবের কর্মে আসক্তি	শ্লোক ১২
৪. কর্মের বিভাগ	শ্লোক ১৬-২২
৫. যজ্ঞের বিভাগ	শ্লোক ২৩-৩২
৬. তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়	শ্লোক ৩৩-৩৯
৭. তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী	শ্লোক ৪০
৮. কর্মযোগী	শ্লোক ৪১-৪২

এই অধ্যায়টির নাম জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ হলেও ভগবান এখানে কর্মযোগের তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষে জ্ঞান ও কর্মযোগের সাম্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

এখানে দুটি কথার নিগূঢ় অর্থ আলোচনা করা উচিত—ফলেচ্ছা ও উদ্দেশ্য।

ফলেচ্ছা—ইহা অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণবশত হয়। ফলপ্রাপ্তির পর ইহা নষ্ট হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য—ইহা নিত্যবস্তু বা পরমাত্মা প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

কর্মযোগ—কর্মযোগের মূলকথা হল কর্তব্য পালন সর্বদা 'নিষ্কামভাবে' এবং 'পরহিতের' দৃষ্টি রেখে করা। কর্মযোগের দ্বারা যে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদিত হয় তা ফলের কামনারহিত হলেও উদ্দেশ্যরহিত হয় না। উদ্দেশ্যরহিত কর্ম কেবল পাগলেরাই করে। কর্মযোগী যখন স্বার্থত্যাগ করে কেবলমাত্র জগৎহিতের জন্যই কর্ম করে তখন ভগবানের হিতৈষণী শক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঐক্য হয় এবং তাঁর মধ্যে ভগবানেরই শক্তি কাজ করে, তার ফলে পরহিত সাধন সহজ হয় ও কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

কর্মযোগে পরাশ্রয়ের (অন্য কিছুর সাহায্যের) প্রয়োজনীয়তা নেই। কেবল পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্ম করাকেই কর্মযোগ বা সেবা বলে। **কর্মযোগী পরিস্থিতির পরিবর্তনও করেন না বা তার সন্ধানও করেন না।** তিনি প্রাপ্ত পরিস্থিতি ভগবানের ইচ্ছা ভেবে তার সদ্ব্যবহার করেন মাত্র। কর্মযোগী অনুকূল পরিস্থিতিতে অপরের সেবা করেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখিতও হন না বা সুখের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তাই কর্মযোগী সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। সেইজন্য কর্মযোগকে রহস্য বলা যেতে পারে, কারণ যে কর্মের দ্বারা মানুষের বন্ধন হয়, কর্মযোগে কর্ম করলে সেই কর্মদ্বারাই মানুষ মুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে কর্মযোগে জ্ঞানসম্পন্ন রাজাগণ রাজ্যভোগে আসক্ত না হয়ে উত্তমরূপে রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং প্রজাদেরও সেইরূপ আচরণ শেখাতেন। প্রজাদের হিতে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকত। মহাকবি

কালিদাস সূর্যবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বলছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ (রঘুবংশ. ১।১৮)

'এই রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সেইভাবেই কর গ্রহণ করতেন, যেমনভাবে সূর্য পৃথিবী থেকে জল গ্রহণ করে সহস্রগুণে বৃদ্ধি করে বৃষ্টিপাত রূপে তা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়।'

একটি আখ্যান—ত্রেতাযুগে চক্রবেণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মাত্মা। রাজা-রানি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ নিজেদের জন্য খরচ করতেন না। প্রজাদের থেকে যে কর আদায় হত তা প্রজাহিতেই ব্যয় করতেন। তাদের জীবিকা নির্বাহ হত চাষ-আবাদ করে এবং তাঁরা অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন, মোটা কাপড় পরতেন ও সাধারণ খাওয়া-দাওয়া করতেন।

একবার রাজ্যে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে শহরের সমস্ত রমণীরা রানিমার কাছে এল। তারা সব ঐশ্বর্যপূর্ণ পোষাক পরে এসেছেন কিন্তু রানির পোশাক খুবই সাধাসিধা। সবাই রানিকে বলল—আপনি আমাদের প্রভু, আপনারও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকাদি পরা উচিত। কিন্তু আপনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে আছেন। রানি ছিলেন খুব ভালো মানুষ। রাত্রে রাজাকে সব কথা বললেন। রাজা বললেন—দেখো ! আমাদের চাষ-আবাদ করে চলে, প্রজাদের টাকা আমি নিজেদের জন্য ব্যয় করতে পারি না। যাইহোক, দেখি কিছু গহনার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

পরদিন রাজা তাঁর এক ব্রাহ্মণ সভাসদকে বললেন—দেখো, আমি রাজা, প্রজাদের কর ছাড়াও অন্য রাজাদের করও গ্রহণ করি। তুমি লঙ্কেশ্বর রাবণের কাছে যাও আর বলো, রাজা চক্রবেন কর দিতে বলেছেন। আর কররূপে সোনা নিয়ে এসো।

সভাসদটি লঙ্কায় গেল আর রাবণকে বলল—মহারাজ চক্রবেণ আপনাকে কর দিতে বলেছেন। রাবণ অট্টহাসি করে বললেন—আরে, জগতে এমন কোনো মূর্খ আছে যে রাবণের কাছ থেকে কর চায়। তুমি এই

মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হও। সভাসদটি রাবণকে চিন্তা করতে বলে এবং পরের দিন আসব বলে চলে গেল।

রাত্রে রানি মন্দোদরীর সঙ্গে দেখা হতে রাবণ সবিস্তারে রাজা চক্রবেণের দূতের কথা বললেন। রানি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন ও চক্রবেণের প্রভাব জানতেন, তিনি বললেন মহারাজ ! কর না দিয়ে ভালো করেননি। রাবণ হাস্য করে বললেন, রানি তুমি বোধহয় আমার মহিমা জান না।

যাইহোক সকালে রানি মহারাজকে আটকালেন ও বললেন মহারাজ ! আমার সঙ্গে একটু আসুন। মন্দোদরী প্রত্যহ ছাদে পায়রাদের শষ্য দিতেন। সেদিন পায়রাদের শষ্য ছিটিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন— মহারাজধিরাজ রাবণের দিব্যি, একটিও দানা কেউ আর খুঁটে খেও না। কিন্তু পায়রারা তা গ্রাহ্য না করে শষ্যদানা খেতে লাগল। রানি বললেন দেখলেন তো আপনার মহিমা। রাবণ বললেন —তুমি কি পাগল, এই ক্ষুদ্র পাখিগুলি কী বুঝবে আমার মহিমা। তখন মন্দোদরী পুনরায় পায়রাদের লক্ষ্য করে বললেন যদি একটি দানাও খুঁটে খাও তো রাজা চক্রবেণের দিব্যি। একথা বলা মাত্রই পায়রাগুলোর দানা খুঁটে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটি পায়রা যেই খুঁটে খেতে গেল তার মাথাটি খসে পড়ল ; কারণ সেটি বধির ছিল, তাই মন্দোদরীর কথা শুনতে পায়নি। রাবণ কিন্তু অবিশ্বাস সহকারে চলে গেলেন।

পরদিন রাজসভাগৃহে চক্রবেণের সভাসদটি আবার উপস্থিত হয়ে বলল—মহারাজ কর দেওয়ার কথা কিছু বিবেচনা করলেন ? কর বাবদ কিন্তু আপনাকে সোনা দিতে হবে। রাবণ হেসে বললেন—তুমি কেমন লোক হে ? দেবতারা পর্যন্ত আমাকে দুবেলা নমস্কার করে, আর আমি কিনা তোমার রাজাকে কর দেব ? সভাসদটি তখন রাবণকে অনুরোধ করল—মহারাজ আপনি আমার সঙ্গে একবার সমুদ্রের ধারে আসুন। অকুতোভয় রাবণ সমুদ্রের ধারে গেলেন। সেখানে লোকটি বালির ওপর লঙ্কা নগরীর মতো একটি ছবি আঁকল আর চারিদিকে আঁকল চার তোরণ। রাবণ বললেন—বাঃ

লঙ্কা নগরী এইরকমই, তুমি তো বেশ কারিগর! তখন লোকটি 'মহারাজ চক্রবেণের দিব্যি' বলে বালিতে আঁকা একটি তোরণ ভেঙে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে রাবণের লঙ্কানগরীর তোরণটিও ভেঙে গেল। তখন সে বলল, মহারাজ কর দেবেন কিনা বলুন, নাহলে আমি সমস্ত লঙ্কা নগরী চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব। রাবণ এবার ভয় পেয়ে তার হাতদুটো ধরে বললেন আর কিছু বলতে হবে না, আমি কর দেব, সোনা দেব।

সভাসদটি রাবণের কাছ থেকে করস্বরূপ গৃহীত সোনা রাজাকে দিলেন ও রাজা রানিকে তা দিয়ে বললেন তোমার ইচ্ছেমতো গহনা গড়িয়ে নাও।

রানি জিজ্ঞাসা করলেন এত সোনা পেলে কোথা থেকে ? রাজা বললেন, রাবণ কর দিয়েছে। রানি শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাবণ কেন কর দেবে। রাজা চক্রবেণ তখন অনুচরটিকে ডেকে সব বলতে বললেন। সব শুনে রানি অবাক, বুঝলেন রাজার কী প্রভাব, কর্মযোগের কী মহিমা ! এর থেকে গহনা কখনোই বড় হতে পারে না। তিনি অনুচরটিকে সব সোনা দিয়ে বললেন রাবণকে সব ফিরিয়ে দাও, বলো মহারাজ চক্রবেণ আপনার কর গ্রহণ করেননি। এইভাবে কর্মযোগ পালন করায় পূর্বযুগে রাজারা জ্ঞান ও ভক্তি স্বতঃই প্রাপ্ত হতেন।

প্রাচীনকালে বড় বড় মুনি-ঋষিগণও জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁদের কাছে যেতেন। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মবিদ্যা আহরণের জন্য রাজা জনক-এর কাছে গিয়েছিলেন, আর ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ছয়জন ঋষি একসঙ্গে রাজা অশ্বপতির কাছে গিয়েছিলেন। রাজার আদর্শে তাঁর রাজ্য কীরকম চলত এ বিষয়ে অশ্বপতি বলছেন—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥ (ছান্দোগ্য. ৫।১১।৫)

'আমার রাজ্যে কোনো চোর নেই, কোনো কৃপণ নেই, কেউ মদিরাসক্ত নয়, অগ্নিহোত্র করে না এমন কেউ নেই, কোনো মূর্খ নেই, পরদারগামী কোনো ব্যক্তিও নেই। তাহলে কুলটা নারী বা থাকবে কী করে'—এই হল কর্মযোগের মহিমা।

ভগবানের জন্মের দিব্যতা—(শ্লোক ৫-৮)

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা ৪।৫-৮)

'ভগবান বলছেন—হে অর্জুন ! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেসব কথা জানি কিন্তু তুমি তা জান না।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সমস্ত প্রাণীকুলের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত হই।

যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উত্থান হয় তখনই আমি অবতার রূপে প্রকট হই।

সাধু অর্থাৎ ভক্তগণকে রক্ষা, দুষ্কৃতি অর্থাৎ পাপকর্মকারীদের বিনাশ এবং ধর্মকে যথাযথ সংস্থাপনের নিমিত্তই আমি যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হই।' (গীতা ৪।৫-৮)

পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সকল প্রাণীর জন্মের নিত্যতা বলে তাঁর পূর্বান্তরীয় জন্মের স্মৃতির কথা বলেছেন। ভগবান ও তাঁর অংশ জীবাত্মা হচ্ছে অনাদি ও নিত্য, এই কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েও বলেছেন **'সর্বে বয়মতঃ পরম্'** (গীতা ২।১২)। কিন্তু পূর্বজন্মের কথা জীব জানতে পারে না। কিছু কিছু ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য জাতিস্মর হয়ে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন, কিছু কিছু সাধক আবার সাধনা বলে সিদ্ধিলাভ করে (যুঞ্জান যোগী) নিজেদের বিগত কিছু জন্মের কথা জানতে পারেন, কিন্তু সমস্ত জন্মের নয়।

শিবকল্প ঋষি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৭৩১ সালে ও তার প্রয়াণ হয়

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। তার সুদীর্ঘ ১৬০ বছরের জীবনে তিনি পৃথিবীর বহুস্থানে তীর্থভ্রমণে গিয়েছেন ; এমনকি মক্কা, মদিনা, প্যালেস্টাইন পর্যন্তও ভ্রমণ করেছেন। মদিনার পথে মরুভূমির মধ্যে তিনি আবদুল গফফুর নামে এক মহাযোগী সাধুর (ফকির) দর্শন পান। সেই সাধুর বয়স তখন ৪০০ বৎসর। বয়সে প্রবীণ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সেই ফকির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উচ্চাবস্থা দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কয় জন্ম। লোকনাথ বাবা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন 'দুই' অর্থাৎ লোকনাথ বাবার গত জন্মের কথা মনে আছে। সেই ফকির আঙুল দিয়ে দেখালেন তিন অর্থাৎ সেই মহাসাধুর মনে আছে গত দুই জন্মের কথা।

ভগবান কিন্তু যুক্তযোগী।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ (গীতা ৭।২৬)

ভগবান বিগত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে জানেন কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য হওয়ায় অজ্ঞানতাবশত তাঁকে কেউ জানতে পারে না। পুনর্জন্মের বৃত্তান্ত মানুষের স্মরণে না থাকার প্রধান কারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনে বিনাশশীল বস্তুর প্রতি মমতা ও আকর্ষণ। এর ফলে মানব জীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে না ও পুনর্জন্মের কথাও স্মরণে আসে না। অর্জুনেরও কামনা ছিল, তিনি বলেছেন **'যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজং ভোগাঃ সুখানি চ'** (গীতা ১।৩৩) অর্থাৎ যাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা তারাই এখানে যুদ্ধে সমাগত। শাস্ত্রে বাসনা ত্যাগের অনেক মহত্তের কথা বলা হয়েছে। সাংসারিক বস্তুতে মমত্ববোধ ও আসক্তিপূর্ণ কামনা না থাকাই হচ্ছে 'অপরিগ্রহ'।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

'অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ' (পা. যো. ২।৩৯)

অর্থাৎ অপরিগ্রহ দৃঢ় হলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

ভগবানের পূর্বজন্মের কথা মনে থাকার কারণ কিন্তু ভিন্ন। তিনি

নিত্যযোগী এবং মায়াধীশ তাই প্রকৃতিকে অধীনস্ত করেই তিনি আবির্ভূত হন।

ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান অবতারকালে তাঁর বিভূতির কথা বলেছেন। অবতারকালে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই শক্তিই প্রকটিত হয়। কিন্তু যখন একটি প্রকাশিত হয় তখন অন্যটি সুপ্ত থাকে।

ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি॥
কেবলা শুদ্ধপ্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥ (চৈ. চ. ম. লীলা ১৯)

যেমন ব্রহ্মমোহনে ভগবানের মাধুর্যশক্তি দমিত হয়ে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর নরসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের দর্শনে হিরণ্যকশিপুর ওপর স্থিত ঐশ্বর্যভাব দমিত হয়ে প্রহ্লাদের ওপর মাধুর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আবার ভগবানের সৌন্দর্যশক্তিও অসাধারণ, যাতে সমস্ত প্রাণীকুলও আকৃষ্ট হয়।

ভগবান যখন শ্রীবৃন্দাবন থেকে মথুরায় গেলেন তখন মথুরাবাসী রমণীগণ বলছেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং।
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ॥ (ভাগবত ১০।৪৪।১৪)

'গোপীরা কী এমন তপস্যা করেছিল যে তারা সর্বদা দুচক্ষুভরে তাঁর এই অপরূপ রূপমাধুরী পান করতেন।'

তাঁর দর্শনে কংসের সভায় মঞ্চস্থিত রাজপুরুষগণও তাদের চিত্ত হারিয়ে ফেলেন—

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্তং ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥ (ভাগবত ১০।৪৩।২১)

'চক্ষু দ্বারা যেন তাঁর রূপ পান করছিলেন, জিহ্বা দ্বারা রূপ লেহন করছিলেন, নাসিকা দ্বারা শরীরের গন্ধ শুকছিলেন এবং যেন বাহু দ্বারা তাঁর শরীর আকর্ষণ করে নিজ হৃদয়ে মিশিয়ে দিতে চাইছিলেন।'

ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের (৩।২।১২) বিদুরের প্রতি উদ্ধবের বাক্য উদ্ধৃত করে মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে বলছেন—

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন
যে রূপের এক কণ ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন।
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ (চৈ. চ. ম. ম. ২১ অ)

ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, মাধুর্য, রূপ নিয়ে যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন প্রকৃতি তো তাঁর বশে থাকেই (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়) স্বয়ং যোগমায়াও তার লীলায় সহায়তা করেন। রাসলীলা কালে—

ভগবানপি তা রাত্রিঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ (ভাগবত ১০।২৯।১)

'সেই শরৎ পূর্ণিমার রাত্রে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে রাসলীলা করতে মনস্থ করলেন।'

সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ভগবান তাঁর অবতাররূপে প্রকট হওয়ার কারণ বলেছেন। ভগবানের অবতার গ্রহণের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ আছে।

বহিরঙ্গ কারণ — ভগবান বলেছেন তাঁর অবতার ধারণ করার কারণ হল —**'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'** (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাব তখনই হয় যখন সংসারে ধর্মের গ্লানি সৃষ্টি হয় এবং অধর্ম বৃদ্ধি পায়, যা মূলত বিনাশশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মানুষের আকর্ষণের জন্য হয়। ধর্মের গ্লানি হলে মানুষের কর্মে সকামভাব প্রবল হয় আর অধর্ম বেশি বৃদ্ধি পেলে মানুষ কর্তব্যচ্যুত হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করে। কামনা থেকেই এই সকল অধর্ম, পাপ, অন্যায় ইত্যাদি উদ্ভূত হয়—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ (গীতা ৩।৩৭)

সুতরাং এই কাম নাশ করার জন্য এবং নিষ্কামভাবের প্রসারের জন্যই ভগবান অবতীর্ণ হন।

পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার অবতার গ্রহণ কালের কার্য বর্ণনা করেছেন। অবতাররূপে ভগবান সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিদের বিনাশ

করে পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করেন।

সাধু—সাধু কাকে বলে—**'সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ'** (গীতা ৯।৩০)

যে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, সেই সাধু। তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ কীর্তন করেন এবং লোক সাধারণে প্রেমভক্তি প্রচার করেন। তাঁদের স্বভাবই হল অপরের মঙ্গল করা। সাধুব্যক্তির দ্বারাই ধর্মের প্রসার হয়। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে সৃষ্টির শুরুতেই বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ (গীতা ৩।১০)

'তোমরা এই যজ্ঞদ্বারাই বর্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদের অভিষ্ট ফল প্রদান করবে'—এই যজ্ঞ হল নিষ্কাম কর্ম, ইহাই হল ধর্ম।

সাধু ব্যক্তি জাগতিক পদার্থ অর্থাৎ শরীর, ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি আকর্ষিত হন না, তাঁর সাধুত্ব তাঁর ভাবের জন্য। ভগবান সাধু ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ করেন মানে তাঁদের জাগতিক সুখ বৃদ্ধি করেন তা নয়, তিনি তাঁদের ভাবকে রক্ষা করেন। আমরা ভাবি পুণ্যবান বা ভক্তর এত বিপদ কেন ? এটা আমাদের দৃষ্টিতে হয়, কারণ আমাদের ধারণা সাংসারিক বস্তুর অপ্রাচুর্যই দুঃখের কারণ। কিন্তু ভক্ত প্রতিকূল (জাগতিক দুঃখদায়ক) অবস্থাতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন, কেননা প্রতিকূল অবস্থা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যত সহায়ক হয় অনুকূল অবস্থা তত নয়। জাগতিক প্রাচুর্য এবং তাতে অনুরাগ ও আসক্তিই হল পতনের কারণ যা প্রতিকূল অবস্থায় দূর হয়। ভগবানের ভক্তকে পরিত্রাণের অর্থ তার সাংসারিক প্রতিকূলতা দূর করে জাগতিক প্রাচুর্য দান করা নয়, তার ভক্তিভাব প্রচারে বাধা দূর করা।

দুষ্কৃতি—যে ব্যক্তি কামনার অতিবৃদ্ধির ফলে মিথ্যা, কপটাচার, ছল ইত্যাদিতে পূর্ণ ; যে নিরাপরাধ, সদ্গুণী, সদাচারী সাধুদের ওপর অত্যাচার করে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মাত্রা জানে না এবং যার বেদাদি শাস্ত্র ও ধর্মের বিরোধিতা করাই স্বভাব সেই হল দুষ্কৃতি। এদের দ্বারাই অধর্মের প্রচার ও

ধর্মের হানি হয়। তাই ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে এদের বিনাশ করেন, কারণ তিনি **'ধর্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ'** (মহাভারত, অ.প.)।

সাধু-মহাত্মাগণ ধর্ম সংস্থাপন করলেও দুষ্টের বিনাশ করেন না যা ভগবান নিজেই করে থাকেন। যেমন সাধারণভাবে ওষুধ দেওয়া, ব্যান্ডেজ করা বা ইঞ্জেকসন দেওয়া কম্পাউন্ডার বা নার্সরাই করে থাকে কিন্তু বড় বড় অপারেশন শল্যচিকিৎসকই করেন, আর কেউ নয়। তবে ভগবান কোনো জীবের প্রতিই দ্বেষভাব রাখেন না। ঈশ্বর প্রদত্ত অন্ন, জল, বায়ু, সূর্য যদি সাধু-দুষ্কৃতি নির্বিশেষে সকলের সমভাবে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তাহলে ভগবানের উদারতা ও সমতা সম্বন্ধে বিশেষ আর কী বলা যাবে!

ভগবান **'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** (গীতা ৯।২৯)। অর্থাৎ ভক্তদের পরিত্রাণ করায় ভগবানের যত কৃপা থাকে, তত কৃপাই তাঁর থাকে দুষ্কৃতিদের বিনাশ করায়। বিনাশ দ্বারা ভগবান তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলেন।

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজং স্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দনেন।
তে তে গতা বিষ্ণুপুরীং প্রয়াতাঃ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥
(পাণ্ডবগীতা)

'ত্রৈলোক্যাধিপতি ভগবান জনার্দন দ্বারা যারা নিহত হয়েছে তারা সকলেই বিষ্ণুলোকে গমন করে। ভগবানের ক্রোধও বরদানের ন্যায় কল্যাণপ্রদ।'

আর ভগবানের অবতার 'ধর্মসংস্থাপন' অর্থাৎ নতুন ধর্ম প্রচার করতে নয়, ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হলে তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন **'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ'** (গীতা ৪।৩) অর্থাৎ আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগই বলব আর এই সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে যেমন যেমন প্রয়োজন হয় ভগবান তেমন তেমন অবতাররূপ গ্রহণ করেন। ভগবানের এই অবতার কখনো বা কারক-পুরুষরূপেও হয়ে থাকে।

কারক-পুরুষ হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন আর ভগবৎধামে অবস্থান করেন কিন্তু ভগবৎকার্যের নিমিত্তই মনুষ্যরূপে

জন্মগ্রহণ করেন।

অন্তরঙ্গ কারণ—জগতে ভক্ত ও দুষ্কৃতি ছাড়াও প্রেমিক ভক্তও আছেন যাঁরা ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে চান, তাঁর লীলা আস্বাদন করতে চান। ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভাবের মূল কারণ হচ্ছে এই একান্তি ভক্তর সঙ্গে মিলন। কেননা ভগবান বলছেন—

মুহূর্তেনাপি সমহর্তুম্ হতবান দানবান বলান্
মদ্ভানাং বিনোদার্থ করোমি বিবিধা ক্রিয়া॥ (পদ্মপুরাণ)

অসুর নিধন উপলক্ষ মাত্র, তা মুহূর্তের ইচ্ছাতেই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের অবতার গ্রহণ ভক্তদের সঙ্গে লীলার জন্যই হয়ে থাকে।

রাসলীলাতেও শুকদেব বলছেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (ভাগবত ১০।৩৩।৩৭)

ভগবানের অবতার ভক্তানুগ্রহর জন্যই। তাঁর মানুষী তনুর সব লীলা ভক্তদের তাঁর দিকে আকর্ষিত করার জন্য।

মানুষের জন্ম ও ভগবানের অবতার-এর পার্থক্য—

জানার পার্থক্য—মানুষের ও ভগবানের অনেকবার জন্ম হলেও পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মানুষ জানে না কিন্তু ভগবান সবই জানেন।

জন্মে পার্থক্য—মানুষ জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির বশ হয়ে নিজ নিজ কৃত কর্মফল ভোগ ও ভোগান্তে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু ভগবান প্রকৃতিকে অধীনস্ত করে যোগমায়ার সাহায্যে স্বয়ং প্রকটিত হন।

কর্মে পার্থক্য—মানুষ বা সকল জীব নিজ কামনা পূরণ ও কর্মফল ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ভগবান কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবানের কর্মের দিব্যতা—(শ্লোক ৯-১১, ১৩-১৪)

অর্জুন ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু ভগবান তাঁর দিব্য-জন্মর কথা বলে পরবর্তী ৪টি শ্লোকে তাঁর কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধেও বলেছেন।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

(গীতা ৪। ৯-১১)

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

(গীতা ৪। ১৩-১৪)

'আমার জন্ম ও কর্ম সবই দিব্য। যে এইভাবে আমাকে (অর্থাৎ আমার জন্ম ও কর্মর দিব্যতা) তত্ত্বত জানে (উপলব্ধি করে) বা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না।

আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবর্জিত হয়ে তদ্‌গতচিত্তে আমার শরণাপন্ন হয়ে এবং জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেক ভক্তই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন।

যে ভক্ত যে-ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবে আশ্রয় দান করি। ভক্তর তাই আমার পথই অনুসরণ করা উচিত।' (গীতা ৪।৯-১১)

'গুণ ও কর্মর বিভাগ অনুসারে চার বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান এই সৃষ্টির কর্তা হলেও তিনি অব্যয় ও অকর্তা।

কর্মফলের প্রতি তাঁর না আছে আসক্তি না তিনি এতে লিপ্ত হন। যে এইভাব উপলব্ধি করে, সেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।' (গীতা ৪।১৩-১৪)

মানুষের কর্মে দিব্যতা—নবম ও দশম শ্লোকে ভগবান তাঁর জন্ম ও কর্মে

দিব্যতার অনুকরণে মনুষ্যের মধ্যে দিব্যতার বিকাশের কথা বলেছেন। ভগবানের লীলা কাহিনী শোনা, পড়া, স্মরণ করা ইত্যাদিতে মানুষের মন পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তাদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই হল ভগবানের অনুকরণে মানুষের দিব্যভাব। ভগবানের অবতার গ্রহণ যেমন স্বাভাবিকভাবে জীবের কল্যাণের জন্য হয় ও তাঁর কর্মে নির্লিপ্ততাও থাকে, সেইরকম ভগবানের লীলা পড়ে বা শুনে মানুষের মধ্যেও সকল জীবের প্রতি হিত চিন্তা এবং কর্মে নির্লিপ্ততার ভাব জাগরূক হয় এবং তাই হল ভগবানের জন্ম ও কর্মর তত্ত্ব জানা। আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে, জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়ে যায় এবং মানুষ জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

ভগবান জগৎ হিতার্থে যেমন রূপ ধারণ করেন, তদনুযায়ী লীলা করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উতঙ্ক ঋষিকে বলছেন—

ধর্মসংরক্ষনার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ।
তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব॥ (মহাভারত, অ. প. ৫৪।১৩-১৪)

'ধর্মসংস্থাপন ও ধর্মরক্ষার জন্য যখন যখন যে যোনিতে আমি জন্মগ্রহণ করি, সেই সেই রূপ ও আকৃতি অনুসারে ব্যবহার করে থাকি।'

ভগবান একাদশ শ্লোকে তাঁর শরণাগত ভক্ত সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি মনুষ্যকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করার জন্য লীলা করলেও যে ভক্ত যেভাবে তাঁর শরণাগত হয়, তিনি তাকে সেইভাবেই আশ্রয়দান করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবান, তাঁর সৃষ্ট সাধারণ মানুষের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, কী মহান তাঁর ঔদার্য, দয়া ও সমপ্রাণতা।

যদিও এখানে **'প্রপদ্যন্তে'** অর্থাৎ শরণাগত ভক্তর সম্বন্ধে বলা হয়েছে তবে ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ (**সুহৃদং সর্বভূতানাং**— গীতা ৫।২৯)। তাই যারা হিংসা-দ্বেষ দ্বারাও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদেরও কল্যাণই হয়।

তাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত দুষ্ট শিশুপালের